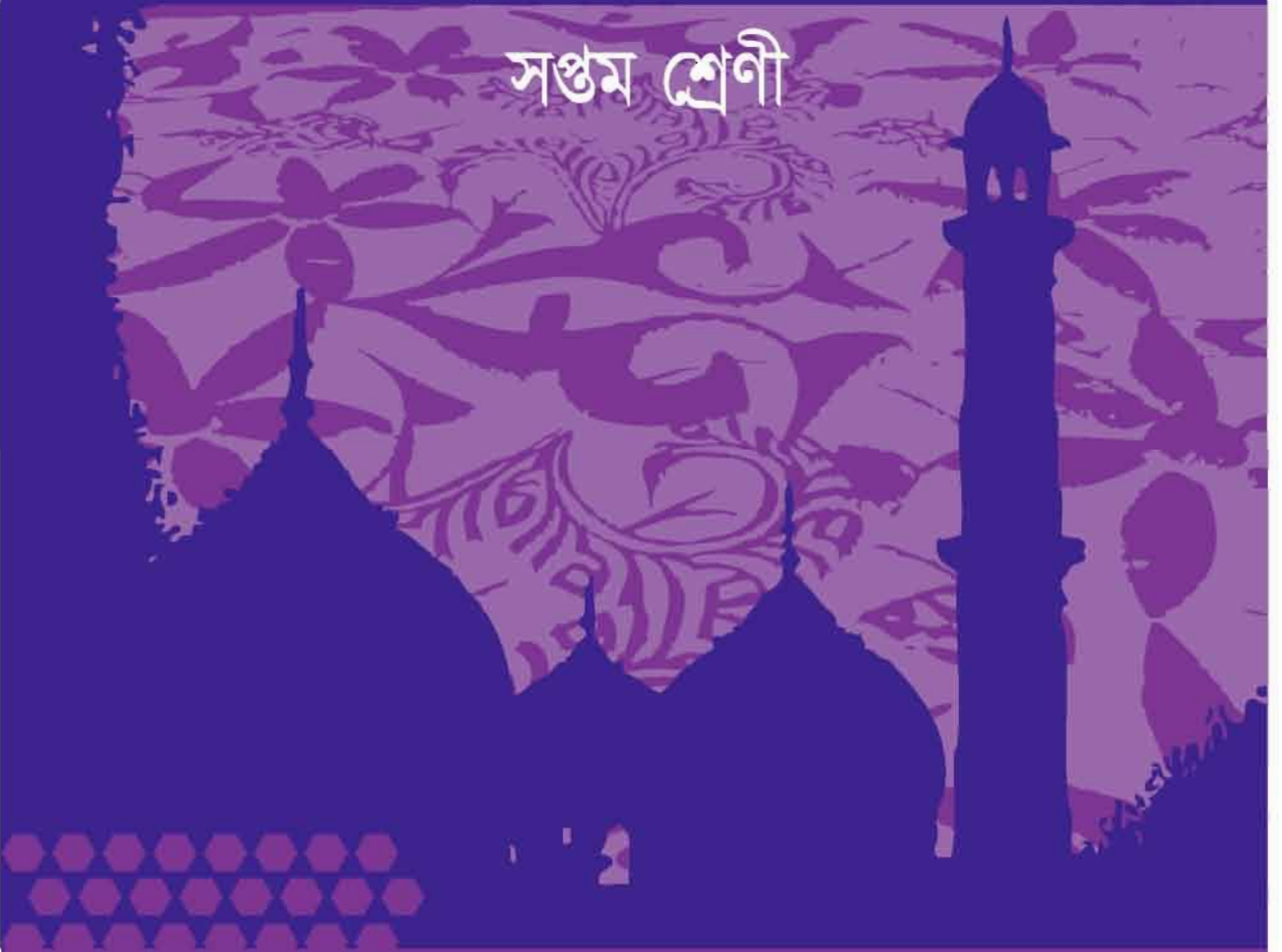


ইসলাম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ
থেকে সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম-শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণী

সংকলন ও রচনা

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক

ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ

হাফেজ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান

সম্পাদনা

প্রফেসর আব্দুল মান্নান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮

কম্পিউটার কম্পোজ

ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ

সেলিম আহমেদ

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মূল্য :

মুদ্রণ :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সমন্বয়যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইসলাম-শিক্ষা আবশ্যিক বিষয়। শিক্ষাক্রমে সপ্তম শ্রেণীর জন্য ইসলাম-শিক্ষা বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক শিখনফলচিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেন সেগুলো পুরোপুরি অর্জন করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে শিখনফলভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শ্রেণীতে আকাইদ, ইবাদাত, কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ শিক্ষা, আখলাক এবং আদর্শ জীবনচরিত সম্পর্কে স্বল্পপরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামের নিয়ম-কানুন জানা ও মানা এবং মূল্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য সহজ বাক্যরীতি, উপমা, শিক্ষামূলক কাহিনী, আদর্শ মানবের জীবনকথা ইত্যাদি অবতারণা করা হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টিতে পুস্তকটি সহায়ক হবে বলে মনে করি। উল্লেখ্য, কিছু আরবি শব্দের বানানের ক্ষেত্রে এনসিটিবি’র বানানরীতি অনুসরণ না করে প্রচলিত বানান অনুসরণ করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণীর ৬০টি পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করে সময়মতো পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর ড. মোঃ মছির উদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : আকাইদ	১-১৩	সূরা লাহাব	৪০
তাওহীদ	১	সূরা ইখলাস, মুনাজাতমূলক আয়াত	৪১
কুফর	২	হাদীস শরীফ, মুনাজাতমূলক হাদীস	৪৩
শিরক	৩	নীতিমূলক হাদীস	৪৪
ঈমান মুফাস্সাল	৪	চতুর্থ অধ্যায় : আখলাক	৪৭-৫৯
আল-আসমাউল হুস্না	৬	আখলাকে হামীদা	৪৭
রিসালাত, ওহী	৯	ক্ষমা, পরোপকার	৪৮
আখিরাত	০	শালীনতা	৪৯
সিরাত, মীযান	১১	সৃষ্টির সেবা	৫০
দ্বিতীয় অধ্যায় : ইবাদাত	১৪-৩১	আমানত	৫১
ইকামাতুস সালাত	১৪	শ্রমের মর্যাদা	৫২
জামাআত, মুক্তাদী	১৫	সততা, সৎ কাজে সহযোগিতা	
মাসবুকের সালাত, মুসাফিরের সালাত	১৬	এবং অসৎ কাজে অসহযোগিতা	৫৩
বুগ্‌গ ব্যক্তির সালাত, জুমাআর সালাত	১৭	আখলাকে যামীমা, হিংসা	৫৪
ঈদের সালাত	১৮	ক্রোধ, লোভ	৫৫
ঈদুল ফিতর, ঈদুল আয্‌হা	১৯	প্রতারণা, ছিনতাই	৫৬
জানাযার সালাত	২১	পিতামাতার অবাধ্য হওয়া	৫৭
তারাবীহের সালাত	২২	পঞ্চম অধ্যায় : আদর্শ জীবন চরিত	৬০-৭৪
তাহাজ্জুদের সালাত	২৩	হযরত ইসমাইল (আ)	৬০
সালাতুল ইশরাক, সালাতুল আওয়াবীন	২৪	হযরত ইউসুফ (আ)	৬১
সাওম	২৫	হযরত আয্যুব (আ)	৬৩
সাহরী	২৬	হযরত মুহাম্মাদ (স)	৬৪
ইফতার, সাওমের কাযা ও কাফ্‌ফারা	২৭	হযরত হাম্‌যা (রা)	৬৫
ইতিকাফ	২৮	হযরত ফাতিমা (রা)	৬৬
সাদাকাতুল ফিতর	২৯	হযরত বিলাল (রা)	৬৭
তৃতীয় অধ্যায় : কুরআন মাজীদ ও		হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)	৬৮
হাদীস শরীফ শিক্ষা	৩২-৪৬	হযরত ইমাম শাফিঈ (র)	৬৯
কুরআন মাজীদ	৩২	হযরত মুঈনুদ্দীন চিশ্তী (র)	৬৯
তাজ্বীদ	৩৩	শাইখ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র)	৭০
মাদ্দ	৩৪	মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র)	৭১
ওয়াক্‌ফ, নাযিরা তিলাওয়াত	৩৫		
সূরা আদিয়াত	৩৬		
সূরা কারিআহ	৩৭		
সূরা তাকাসূর	৩৮		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ (الْعَقَائِدُ)

আকাইদ (عَقَائِدُ) শব্দটি আকীদাহ (عَقِيدَةٌ) এর বহুবচন, অর্থ বিশ্বাসমালা। অর্থাৎ ইসলামের মূল বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই হল আকাইদ। যেমন- তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

তাওহীদ (تَوْحِيدٌ)

অর্থ ও পরিচয়

তাওহীদ (تَوْحِيدٌ) শব্দের অর্থ একত্ববাদ, আল্লাহ তাআলাকে এক বলে স্বীকার করা। ইসলামী পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ইবাদাতের একমাত্র হকদার বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস ও স্বীকার করাকেই তাওহীদ বলে।

গুরুত্ব

ঈমানের মূল কথা হল আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মূল কথা হল তাওহীদে বিশ্বাস। ঈমান আনার মাধ্যমে আমরা ঘোষণা করি, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। এই ঘোষণার মাধ্যমে আমরা ইসলামের সকল বিধিবিধান মেনে নেই। ইসলামের সকল বিধান এবং সকল শিক্ষাই তাওহীদে বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

যুগে যুগে মানুষ তাওহীদ শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে বিপথগামী হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির দাসে পরিণত করেছে। কখনও চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রকে পৃথিবীর মূল শক্তি মনে করে এগুলোর কাছে মাথা নত করেছে। কখনও আগুনের পূজা করেছে। কখনও কোন প্রভাবশালী মানুষকে মহাশক্তির আধার মনে করে তার পূজা করেছে। কখনও কাল্পনিক মূর্তি তৈরি করে তার নিকট মাথা নত করেছে। আবার কখনও কখনও মানুষ ক্ষমতার বলে ভারসাম্য হারিয়ে নিজেকেই অপর মানুষের উপাস্য ও প্রভু বলে ঘোষণা করেছে। সমাজের এই ভ্রান্ত মতবাদ ও অসংখ্য প্রভুর গোলামী থেকে মানব জাতিকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।

নবী-রাসূলগণ মানুষকে তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আজীবন কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবীই তাওহীদের শিক্ষা প্রচার করেছেন।

তাওহীদে বিশ্বাসীগণ অন্য কোন মানুষ, শক্তি বা প্রকৃতির কাছে মাথা নত করে না। এ বিশ্বাস মানুষের আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যদাবোধ জাগিয়ে তোলে। সকল বিভেদ ভুলিয়ে দিয়ে বিশ্ববাসীর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে। এতে মানুষের মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়। মানুষ সংকর্মে প্রতি অনুপ্রাণিত হয়। তাওহীদে বিশ্বাসী মানুষ যেমন শান্তিপ্রিয়, তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও সাহসে বলীয়ান।

তাৎপর্য

কত সুন্দর আমাদের পৃথিবী। আমাদের মাথার ওপর বিশাল আকাশ। এতে রয়েছে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র। আছে কত ছায়াপথ, নীহারিকাপুঞ্জ। সৃষ্টির সূচনা থেকে এগুলো একটি নির্ধারিত নিয়মে পরিচালিত হয়ে আসছে। এগুলোর মধ্যে নেই কোন সংঘাত, সংঘর্ষ। পৃথিবীতে আছে নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত। এগুলো একটি নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। দিন-রাতের আবর্তন, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, কোন কিছুতেই কোন প্রকার অনিয়ম নেই। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এ বিশাল সৃষ্টির এক মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী আছেন। একের অধিক সৃষ্টিকর্তা থাকলে এরূপ নিয়ম শৃঙ্খলা থাকত না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ

অর্থ : “যদি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।” (আম্বিয়া ২১ : ২২)

বস্তুত নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা যদি একের অধিক হতেন, তবে মহাবিশ্বের চিরন্তন নিয়মে ব্যাঘাত ঘটত। এক রাজ্যের স্বত্বাধিকারী একাধিক বাদশাহ থাকলে সে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত হওয়াটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলা বলেন, “তার (আল্লাহর) সাথে কোন ইলাহ নেই। যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত।” (মু’মিনুন ২৩ : ৯১)

এতে প্রমাণিত হয় যে, নিখিল বিশ্বের সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা মাত্র এক আল্লাহ। তিনিই মহান আল্লাহ। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। এ বিশ্বাসের নামই তাওহীদ।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. তাওহীদের অর্থ ও পরিচয়।
২. তাওহীদের গুরুত্ব।
৩. তাওহীদের তাৎপর্য।

আমরা তাওহীদে বিশ্বাস করব। একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই সকল ক্ষমতার অধিকারী বলে জানব। কেবল তাঁরই ইবাদাত করব। আমরা আল্লাহর রহমত পাব।

কুফর (كُفْرٌ)

ইসলামের মূল বিষয়গুলোতে অবিশ্বাস করা হল কুফর। কুফর (كُفْرٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ ঢেকে রাখা, গোপন করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, অবিশ্বাস করা ও অস্বীকার করা। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর অস্তিত্বকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা কুফর। যে সকল ইসলামী বিধান কুরআন ও হাদীস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত, তার কোন একটিকে অস্বীকার করাও কুফরের শামিল। যে ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত হয় তাকে বলা হয় কাফির (كَافِرٌ)।

কুফর ঈমানের বিপরীত। আল্লাহর একত্ববাদ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল, তাক্দ্দীর, কিয়ামত এসব বিষয়ের কোন একটিকে অবিশ্বাস করা বা অস্বীকার করা কুফর। আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান আনার সাথে সাথে তাঁদের আদেশ নিষেধ পালন না করাও কুফর। ইসলামের নির্ধারিত আদেশ নিষেধ অবিশ্বাস করাও কুফর। সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইসলামে ফরয। এগুলো অবশ্য পালনীয়। এতে যদি কেউ অবিশ্বাস করে বা কাউকে পালনে বাধা দেয় তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

এমনিভাবে মদ, জুয়া, সুদ, হত্যা ইত্যাদি হারাম কাজের কোন একটি হালাল মনে করাও কুফরের শামিল।

কুফরের কুফল

কাফির ব্যক্তি পরম দয়াময় আল্লাহ তাআলার প্রতি অকৃতজ্ঞ। তাঁর একচ্ছত্র অধিকার সে অস্বীকার করে। তাঁর নিয়ম শৃঙ্খলা ও আইন কানূনের সে বিদ্রোহী। কাফিরের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

অর্থ : “যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।” (বাকারা ২ : ৩৯)

কাফির বিদ্রোহী যদি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায়, তাওবা করে, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, অপরাধ না করার দৃঢ় সংকল্প করে তবে সে ক্ষমা পাওয়ার আশা করতে পারে।

শির্ক (شِرْكٌ)

শির্ক (شِرْكٌ) অর্থ অংশীবাদ অর্থাৎ একাধিক সৃষ্টি, একাধিক নিয়ন্ত্রণকারী ও একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস। মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা বা কাউকে তাঁর সমপর্যায়ের মনে করাকে শির্ক বলে। আল্লাহর ইবাদাতে অন্য কোন ব্যক্তি বা শক্তিকে শামিল করাও শির্ক। যে ব্যক্তি শির্ক করে তাকে বলা হয় মুশরিক (مُشْرِكٌ)।

মহাপরাক্রমশালী বিশ্বসৃষ্টির সজ্ঞা অন্য কাউকে তাঁর সমগুণসম্পন্ন বা সমশক্তি সম্পন্ন মনে করা ও তার উপাসনা করা, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে যে কোন গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন, কিন্তু কেউ শির্ক করলে তিনি মাফ করবেন না। এ সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۝

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার গুনাহকে ক্ষমা করবেন না। তা ব্যতীত যে কোন গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” (নিসা ৪ : ১১৬)

ইসলামপূর্ব যুগে যত প্রকার পাপাচার হত তার মধ্যে শির্ক ছিল প্রধান। তাই আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) তার নবুওয়্যাত জীবনের প্রথম তেরটি বছর শির্ক দূরীভূতকরণ ও মানুষের মনে আল্লাহর একত্বের ধারণা বন্দ্বমূল করার জন্য কঠোর সাধনা করেছিলেন।

শির্ক এর কুফল

শির্ক কেবল যে অমার্জনীয় অপরাধ তাই নয়, শির্কে লিপ্ত মানুষ তার নিজেরও অমর্যাদা করে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। মানুষের এমন কিছু গুণ দেওয়া হয়েছে যা দ্বারা সে অন্য সব সৃষ্টিকে বশে এনে নিজের উপকারে ব্যবহার করতে সক্ষম। কিন্তু মুশরিক এসব সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে। এ হচ্ছে মানবতার চরম অবমাননা।

শির্কের কারণে সমাজের বিভেদ সৃষ্টি হয়। পরিবেশ নষ্ট হয়। শান্তি-শৃঙ্খলা থাকে না। মানুষের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। শির্ক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তবে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারেন।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. শির্ক ও কুফরের পরিচয়।

২. শির্ক ও কুফরের কুফল।

আমরা কুফর ও শির্ক থেকে দূরে থাকব। আল্লাহর রহমত পাব। আমাদের জীবন সুন্দর হবে।

ঈমান মুফাস্সাল (إِيمَانٌ مُّفَصَّلٌ)

উচ্চারণ

আমানতু বিল্লাহি

أَمَنْتُ بِاللَّهِ

ওয়া মালাইকাতিহী

وَمَلَائِكَتِهِ

ওয়া কুতুবীহী

وَكُتُبِهِ

ওয়া রুসূলীহী

وَرُسُلِهِ

ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ওয়াল কাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী

وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

মিনাল্লাহি তাআলা

مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত।

وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ : আমি ঈমান আনলাম ১. আল্লাহর ওপর ২. তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর ৩. তাঁর কিতাবসমূহের ওপর ৪. তাঁর রাসূলগণের ওপর ৫. শেষ বিচারের দিন কিয়ামতের ওপর ৬. তাকদীরের ওপর—এর ভাল মন্দ আল্লাহর তরফ থেকেই নির্ধারিত ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর।

ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য

ঈমান অর্থ বিশ্বাস, মুফাস্সাল অর্থ বিস্তারিত। ঈমান মুফাস্সাল অর্থ বিস্তারিত বিশ্বাস। এ কালিমায় ঈমানের বিষয়সমূহের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কী কী বিষয়ের ওপর ঈমান আনতে হবে তা বলা হয়েছে। এ কালিমায় সাতটি বিষয়ের ওপর ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—

১. আল্লাহর ওপর ঈমান : সর্বপ্রথম আমাদের আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে—

ক. আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি অনাদি অনন্ত

তিনি সদা বিরাজমান। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। যখন কিছুই ছিল না তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন। আবার যখন কিছুই থাকবে না তখন একমাত্র তিনিই বিরাজমান থাকবেন।

খ. আল্লাহ নিখিল বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও মালিক

এ সুন্দর পৃথিবী, চাঁদ, সুরজ, গ্রহ-তারা, সাগর-উপসাগর, পাহাড়-পর্বত, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, যা কিছু আছে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা, প্রভু ও পালনকর্তা একমাত্র তিনিই।

গ. সমগ্র বিশ্বের তিনিই পরিচালক

আল্লাহ তাআলা সমগ্র বিশ্ব পরিচালনা করেন। তাঁর নির্দেশেই সব কিছু জন্মে ও মৃত্যুবরণ করে। তাঁর ক্ষমতায় কারও বিন্দুমাত্র দখল নেই।

ঘ. ইবাদাত ও আনুগত্যের যোগ্য একমাত্র তিনিই

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তা মানুষের ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নয়। তিনি অনাদি, অবিনশ্বর, সর্বশক্তিমান ও অতুলনীয়। তিনিই একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান

ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী। অদৃশ্য সত্তা। আল্লাহর নির্দেশে তাঁরা যে কোন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তাঁদের আহার নিদ্রার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর যিক্র তাঁদের জীবন। আল্লাহর নির্দেশ পালনে তাঁরা সদা প্রস্তুত থাকেন। ফেরেশতাগণের মধ্যে চারজন বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। ক. হযরত জিবরাঈল (আ) যিনি নবী-রাসূলগণের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছাতেন। খ. হযরত মীকাঈল (আ) জীবের জীবিকা বণ্টন করে থাকেন। গ. হযরত ইসরাফীল (আ) জীবের বৃহৎ কব্জ করেন। ঘ. হযরত ইসরাফীল (আ) সিংগা নিয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহর আদেশ পেলে সিংগায় ফুৎকার দেবেন এবং কিয়ামত আরম্ভ হবে। এছাড়াও আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতাগণ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছেন।

৩. কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহর কিতাবের প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে পথহারা মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূলগণের নিকট কিতাব পাঠিয়েছেন। আমাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআনুল কারীম হচ্ছে আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর যে সকল কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সেগুলোর ওপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে।

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। সর্ব প্রথম নবী হলেন হযরত আদম (আ) এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)। তাছাড়া আরো অসংখ্য নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন। তাঁরা সকলেই তাওহীদের বাণী প্রচার করে গেছেন। প্রত্যেক জাতির নিকটই কোন না কোন নবী প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে।

৫. কিয়ামতের প্রতি ঈমান

প্রত্যেক বস্তুই শেষ আছে। জন্ম হলে মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং মহাবিশ্বেরও শেষ আছে। একদিন আল্লাহর নির্দেশে এই সুন্দর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর বিচারের জন্যে জীবের পুনরুত্থান হবে। একেই বলে কিয়ামত। কিয়ামত অবশ্যই হবে। তবে, কবে সংঘটিত হবে তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

৬. তাক্দ্দীরের প্রতি ঈমান

মানুষের তাক্দ্দীর বা ভাগ্য আল্লাহর হাতে। ভাগ্যের ভাল ও মন্দ আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। মানুষের কর্মের ওপর তিনি ভালমন্দ নির্ধারণ করেন। করুণাময় আল্লাহ তাআলা অবশ্যই ভাল কাজের ভাল ফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল দিয়ে থাকেন। আমাদের ভাগ্যে কি আছে আমরা জানি না। আমাদের সৌভাগ্যের জন্যে কাজ করে যেতে হবে। ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে অলসভাবে বসে থাকা মোটেই সমীচীন নয়।

৭. পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান

আল্লাহর হুকুমে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আবার সকলকে জীবিত করে একত্রিত করা হবে। একেই হাশ্র বলে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের ভালমন্দ কাজের হিসাব নেবেন। পৃথিবীতে যাঁরা ভাল কাজ করেন আল্লাহ তাআলা তাঁদের জান্নাত দান করবেন। জান্নাত চির সুখময় স্থান। জান্নাতীগণ অনন্তকাল সেখানে পরম সুখে বসবাস করবেন। যাঁরা মন্দ কাজ করে তাদের জাহান্নামে পাঠানো হবে। জাহান্নাম চরম কষ্টের স্থান। জাহান্নামীরা চিরকাল সেখানে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করতে থাকবে।

উল্লেখিত সাতটি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যে ব্যক্তি এর কোন একটিতেই ঈমান না আনে সে অবিশ্বাসী বলে গণ্য হবে। তাকে পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. ঈমান মুফাস্সালের অর্থ।
২. ঈমান মুফাস্সালের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য।
৩. ঈমান মুফাস্সালের বিষয়বস্তু সাতটি।

আমরা ঈমান মুফাস্সালের সকল বিষয়ের ওপর ঈমান আনব। মনে প্রাণে বিশ্বাস করব। আল্লাহ খুশি হবেন। আমাদের জীবন সার্থক হবে। পরকালে আমরা জান্নাত লাভ করতে পারব।

(الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) আল্-আস্মাউল হুসনা

পরিচয়

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল সৃষ্টির লালন-পালনকর্তা। তিনি পরম দয়ালু। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছু দেখেন, সব কথা শোনেন। তিনি সকল গুণের আধার। তাঁর গুণের সাথে অন্য কারও গুণের তুলনা হয় না। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ

অর্থ : “কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।” (শূরা ৪২ : ১১)

আল্লাহর সত্তা যেমন অনাদি ও অনন্ত, তেমনি তাঁর গুণাবলিও অনাদি ও অনন্ত। তাঁর অনেকগুলো গুণবাচক নাম আছে যাকে আল-আস্মাউল হুসনা বলা হয়। আস্মা অর্থ নামসমূহ আর হুসনা অর্থ সুন্দরতম। আল্-আস্মাউল হুসনা অর্থ সুন্দরতম নামসমূহ। আল্লাহ তাআলা এ নামগুলোর মাধ্যমে আমাদের কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন। নিজের গুণাবলির কথা প্রকাশ করেছেন এবং এসব নামে তাঁকে ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, “আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে, তাঁকে সেসব নামেই ডাক। যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথ অবলম্বন করে (অর্থাৎ যারা তাঁর প্রতি ভিন্ন নাম আরোপ করে) তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেওয়া হবে।” (আ'রাফ ৭ : ১৮০)

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুসলমানগণ আল্লাহকে আল্লাহ, রাহমান, রাহীম, লাতিফ, খাবীর প্রভৃতি নামে ডাকবে, অন্য কোন নামে নয়।

প্রভাব

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আল্-আস্মাউল হুসনার প্রভাব অপরিসীম। এগুলো মানব জীবনের জন্য আদর্শ স্বরূপ। মানব চরিত্র এর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠা উচিত। যেমন- আল্লাহ দয়ালু, তিনি সবার প্রতি দয়া করেন। আমরা দয়ালু হব। অন্যের প্রতি দয়া করব। আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, আমরা সৃষ্টিধর্মী হব। বড় হয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার দ্বারা সমাজ ও দেশকে সমৃদ্ধ করব। আল্লাহ ক্ষমাশীল। আমরাও ক্ষমা করতে শিখব। আল্লাহ রিযিকদাতা। আমরাও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেব। আল্লাহ শান্তিদাতা। আমরাও মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেব। আল্লাহ পরম ধৈর্যশীল, আমরাও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করব, বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করব।

আল্-আস্মাউল হুসনা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সুন্দর করে। এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে সমাজের মানুষ পরস্পরের প্রতি সহনশীল হয়। একে অপরকে সহযোগিতা করে। অসহায় ও অনাথকে সাহায্য করে।

মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি। আল্লাহ চান মানুষের মধ্যে তাঁর গুণের বিকাশ ঘটুক। মানুষ তার গুণে গুণান্বিত হোক। এ কারণে ইসলামে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার তাকীদ রয়েছে। বলা হয়েছে—

تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ ۝

অর্থ : “তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।”

সুন্দর ও চরিত্রবান মানুষ হওয়ার জন্য আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আল্লাহর গুণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে তাঁর আদেশমত চলা সহজ হয়। অন্যায় কাজ পরিহার করা সম্ভব হয়।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. আল্-আস্‌মাউল হুসনার অর্থ।

২. মানব জীবনে আল্-আস্‌মাউল হুসনার প্রভাব।

আমরা আল্-আস্‌মাউল হুসনার তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করব। এর আলোকে আমাদের জীবন গড়ে তুলতে যত্নবান হব।

(اللَّهُ حَيٌّ) আল্লাহু হায়্যুন

‘হায়্যুন’ শব্দের অর্থ চিরজীব। ‘আল্লাহু হায়্যুন’ অর্থ আল্লাহ চিরজীব। তাঁর মৃত্যু নেই, তাঁর কোন ক্ষয় নেই। জরা, ব্যাধি, অবসাদ, ক্লান্তি, তন্দ্রা, নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে—

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ط

অর্থ : “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরজীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না।”

(বাকারা ২ : ২৫৫)

যখন কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব ছিল না তখনও তিনি ছিলেন, আবার যখন সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে তখনও তিনি থাকবেন।

আল্লাহ পাক বলেন, “ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া।”

(রাহ্মান ৫৫ : ২৬-২৭)

সকল প্রাণীর প্রাণ দানকারী তিনি। সকল জীবকে প্রাণ দান করেন। আল্লাহ চিরজীব। আমরা তাঁরই বান্দা। আমরা আমাদের কাজ-কর্মে সজীব, প্রাণবন্ত থাকব। উদ্যমশীল হব। নির্জীবতা পরিহার করব। নিজ কাজে মনোযোগী হব।

(اللَّهُ قَيُّومٌ) আল্লাহু কায়্যুমুন

‘কায়্যুমুন’ শব্দের অর্থ চিরস্থায়ী, চিরবিরাজমান, চিরবিদ্যমান। ‘আল্লাহু কায়্যুমুন’ অর্থ আল্লাহ চিরস্থায়ী। সকল বস্তুর ব্যবস্থাপক। আসমান-জমিনের যাবতীয় বস্তু তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, আলো-বাতাস তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় আকাশে তারার মেলা বসে, গোলাপ সুরভি ছড়ায়, পাখি কলরব করে, নদী প্রবাহিত হয়, চন্দ্র-সূর্য কিরণ দেয়। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় বিরাণ প্রান্তর লোকালয়ে পরিণত হয়, শূষ্ক ধরণী সবুজ হয়ে ওঠে, মরুভূমির বুক ফেটে সুপেয় পানির ঝরণা বেরিয়ে আসে। চিরকর্মময় তিনি। নিত্য নতুন কাজে রত থাকেন তিনি। আমরা তাঁর মহাব্যবস্থাপনা ও চিরকর্মময়তার গুণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। আলস্য পরিহার করব। নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে অধিক আগ্রহী হব।

আল্লাহু আযীযুন (اَللّٰهُ عَزِيزٌ)

‘আযীযুন’ শব্দের অর্থ মহাপরাক্রমশালী। ‘আল্লাহু আযীযুন’ অর্থ আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী। তাঁর ক্ষমতা অসীম। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর কাজে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও নেই। কোন শক্তিই তাঁকে অপারগ করতে পারে না। কেউ তাঁকে ফাঁকি বা ধোঁকা দিতে পারে না, তাঁকে প্রতারণা করতে পারে না। সব কিছুই তাঁর শক্তির সীমার মধ্যে। তিনি যদি পাপীকে শাস্তি দিতে চান তবে তাঁর শাস্তি প্রতিরোধ করার সাধ্য কারও নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

অর্থ : “আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডদানকারী।” (আল ইমরান ৩ : ৪)

তিনি নাবহমান দুর্ধর্ষ ‘আদ’ ‘সামূদ’ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করেছেন। ফিরআউন ও নমরূদের মত খোদায়ী দাবীদার যালিম শাসকের দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন, তাদেরকে অপমানজনক মৃত্যুর সম্মুখীন করেছেন। নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়কে মহাপ্লাবনে ধ্বংস করেছেন। আব্রাহার হস্তী বাহিনীকে ছোট ছোট পাখি দ্বারা পর্যুদস্ত করেছেন। এমনিভাবে তিনি যুগে যুগে অনেক শক্তিশ্রম অত্যাচারী সম্প্রদায়কে বিনাশ করেছেন। কেউ তাঁর শাস্তি ঠেকাতে পারেনি।

আমরা আল্লাহ তাআলার আযীয গুণের গুরুত্ব উপলব্ধি করব। ভাল কাজ করব। পাপের কাজ পরিহার করব। আমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাব।

আল্লাহু খাবীরুন (اَللّٰهُ خَبِيرٌ)

‘খাবীরুন’ শব্দের অর্থ সম্যক অবহিত। ‘আল্লাহু খাবীরুন’ অর্থ আল্লাহ সবকিছুর খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান থেকে গোপন নয়। তাঁর অজানা নয়। তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী। সরিষার দানা পরিমাণও যদি কোন বস্তু পাথরের ভেতরে বা আকাশে কিংবা ভূ-গর্ভে থাকে তবে আল্লাহ তারও খবর রাখেন। গাছের পাতার পতনের খবরও আল্লাহ রাখেন। অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও তাঁর অজানা নয়। তিনি মানুষের অন্তরের খবর রাখেন। গোপন নিয়্যাতের কথা জানেন। পাপ-পুণ্যের খবর রাখেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।” (হুজরাত ৪৯ : ১৩)

আমরা আল্লাহর খাবীর গুণের তাৎপর্য বুঝব। সদাসতর্ক থাকব। ভাল কাজ করব। অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকব। চিরসুখী হব।

আল্লাহু সাব্বুরুন (اَللّٰهُ صَبُوْرٌ)

‘সাব্বুরুন’ শব্দের অর্থ মহাধৈর্যশীল, পরম সহনশীল। ‘আল্লাহু সাব্বুরুন’ অর্থ আল্লাহ মহাধৈর্যশীল। তাঁর ধৈর্যের সীমা নেই। তিনি মানুষকে অসংখ্য নিআমত দান করেছেন। মানুষের জীবনকে সুন্দর করার জন্য নানা রকম বস্তু সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্য জমিনকে বিছানাস্বরূপ এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ তৈরী করেছেন। আলো, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু মূর্ত্যবশত মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। আল্লাহর নাবহমানী করে। আল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে দেয়। তবুও আল্লাহ তাত্ক্ষণিক শাস্তি দেন না। তিনি ধৈর্যধারণ করেন। মানুষকে তাওবা করার এবং অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ দেন। সাথে সাথে শাস্তি দিলে এ পৃথিবীতে কোন জীবনের অস্তিত্বই থাকত না। মানুষ ধ্বংস হত তাদের পাপের কারণে আর তাদের কারণে অন্যান্য জীবও ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। আমরা আল্লাহর ‘সাব্বুরুন’ গুণের তাৎপর্য অনুধাবন করব। বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করব। অন্যের অসদাচরণে সাথে সাথে প্রতিশোধ নেব না। আল্লাহ আমাদের প্রতি খুশি হবেন। আমরা তাঁর রহমত পাব।

আল্লাহ পরম ধৈর্যশীল। আমরা আল্লাহর এই গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করব।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. ‘হায়্যুন’ শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য।
২. ‘কায্যুমুন’ শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য।
৩. ‘আযীযুন’ শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য।
৪. ‘খাবীরুন’ শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য।
৫. ‘সাবরুন’ শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য।

রিসালাত (رِسَالَةٌ)

অর্থ ও পরিচয়

রিসালাত (رِسَالَةٌ) অর্থ বার্তা, চিঠি বা সংবাদ বহন। শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহ পাকের পবিত্র বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছানোকে রিসালাত বলে। যাঁরা এ দায়িত্ব পালন করেন তাঁদেরকে রাসূল বলা হয়। রাসূলগণ ছিলেন নিষ্পাপ ও মানবদরদী। নবী ও রাসূলের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। যাঁদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে গ্রন্থ বা সহীফা (পুস্তিকা) নাযিল হয়েছে তাঁদের রাসূল বলে। যাঁদের কাছে গ্রন্থ বা সহীফা নাযিল হয়নি তাঁদের নবী বলে। প্রত্যেক রাসূল নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন। নবীগণের সংখ্যা অনেক।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনকারী হচ্ছেন নবী ও রাসূলগণ। তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছে তাঁর বাণী পাঠিয়েছেন। রাসূলগণ আল্লাহর কিতাব অনুসারে মানব জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

অর্থ : “আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে অবশ্যই রাসূল পাঠিয়েছি।” (নাহুল ১৬ : ৩৬)

তাওহীদের ওপর ঈমান আনা যেমন ফরয, রিসালাতের ওপর ঈমান আনাও তেমনি ফরয। আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যেক রাসূলের প্রতি ঈমান রাখতে হবে, তা না হলে ঈমান পূর্ণ হবে না। যারা নবীগণের প্রতি ঈমান আনেনি তাদের অনেকেই আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. রিসালাতের অর্থ ও গুরুত্ব।
২. নবী ও রাসূলের পার্থক্য।

আমরা সকল নবীকে সত্য বলে জানব ও বিশ্বাস করব। আমরা নবীর আদর্শ অনুসরণ করে চলব।

ওহী (وَحْيٌ)

অর্থ ও পরিচয়

ওহী (وَحْيٌ) অর্থ গোপন কথা, ইজ্জিত। কোন ব্যক্তির নিকট গোপনভাবে প্রেরিত এমন সংবাদ যা অন্যের নিকট গোপন থাকে। শরীআতের পরিভাষায়, কোন নবীর নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বাণীকে ওহী বলে।

আল্লাহ তাআলা কখনও সরাসরি ওহী প্রেরণ করেছেন আবার কখনও ফেরেশতার মাধ্যমে। হযরত মুসা (আ) তুর পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। আর আমাদের প্রিয় নবী (স) মি'রাজে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন। এটা সরাসরি ওহী। হযরত জিবরাঈল (আ) নবীগণের নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।

ওহী দুই প্রকার

(ক) মাতলু : এর অর্থ যা তিলাওয়াত করা হয়। কুরআন মাজীদকে ওহী মাতলু বলে। কেননা কুরআন মাজীদ সালাতের মধ্যে ও বাইরে তিলাওয়াত করা হয়।

(খ) গাইর মাতলু : এর অর্থ যা তিলাওয়াত করা হয় না। হাদীস শরীফকে ওহী গাইর মাতলু বলে। কারণ তা সালাতে তিলাওয়াত করা হয় না।

ওহীর গুরুত্ব অপরিমিত। ওহী আল্লাহর বাণী, আর আল্লাহ তাআলার বাণীই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীস ওহীর মাধ্যমেই পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ (স) ওহী ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলতেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে বলেন—

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

অর্থ : “তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এটা তো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।” (নাজম ৫৩ : ৩, ৪)

শরীআতের সকল বিধি-বিধান ওহী থেকেই প্রাপ্ত। রাসূলুল্লাহ (স) এর ওপর নাযিলকৃত ওহীর মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ, পরকাল এবং জান্নাত ও জাহান্নামের জ্ঞান লাভ করতে পারি। ওহীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন না করলে ঈমানদার হওয়া যায় না।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. ওহীর অর্থ ও গুরুত্ব।

২. ওহীর প্রকারভেদ।

আমরা ওহীতে বিশ্বাস করব। কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেদের জীবন গড়ে তোলব।

আখিরাত (الْآخِرَةُ)

আখিরাত (الْآخِرَةُ) অর্থ পরকাল। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে শরীআতের পরিভাষায় ‘আখিরাত’ বলা হয়। কবর, হাশর, কিয়ামত, মীযান, সিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম এ সব কিছুই আখিরাতের অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী ও অনন্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۚ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝

অর্থ : “এ দুনিয়ার জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।” (মু'মিন ৪০ : ৩৯)

আখিরাতের বিশ্বাস

আখিরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। আখিরাতের ওপর বিশ্বাস ছাড়া আল্লাহ, রাসূল ও কিতাবের ওপর বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

অর্থ : “তারা (মুমিনগণ) আখিরাতের ওপর নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস স্থাপন করে।” (বাকারা ২ : ৪)

দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি কাজের ফল আখিরাতে ভোগ করতে হবে, এ বিশ্বাস থাকলে মানুষ কখনও মন্দ কাজ করতে পারে না। ভাল কাজের পুরস্কার পাবার আশা এবং খারাপ কাজে ঐ শাস্তির ভয় থাকলে মানুষ স্বভাবত ভাল কাজ করতে উৎসাহী হয় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। আখিরাতের উত্তম ফল লাভের আশায় সে সর্বদা ভাল কাজ করবে। মন্দ কাজ পরিহার করবে। বলা হয়ে থাকে—

الدُّنْيَا مَرْزَعَةُ الْآخِرَةِ ۝

অর্থ : “দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।”

পরকালে এই দুনিয়ার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। সেখানে কোন আমলের সুযোগ থাকবে না। দুনিয়াতে ভাল কাজ করলে আখিরাতে এর ফল পাওয়া যাবে বহুগুণে।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. আখিরাতের অর্থ।

২. আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব।

৩. দুনিয়ায় নেক আমল করার গুরুত্ব।

আমরা আল্লাহ ও রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে আখিরাতের ওপরও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করব।

سِرَاطٌ (صِرَاطُ)

সিরাত (صِرَاطُ) অর্থ রাস্তা। শরীআতের পরিভাষায় সিরাত এমন একটি পুঁল যা কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের ওপর স্থাপিত হবে। “সিরাত চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম এবং তরবারি অপেক্ষা অধিক ধারাল হবে।” (মুসলিম)

সকল মানুষকেই এ সিরাতের উপর আরোহণ করতে হবে। সর্বপ্রথম আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবেন। ঈমানদারগণ নিজ নিজ নেক আমল অনুসারে অতি সহজে সিরাত অতিক্রম করতে থাকবেন। কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, আবার কেউ দ্রুত কদমে সিরাত অতিক্রম করবে। কাফির মুশরিকরা সিরাত অতিক্রম করার সময় জাহান্নামে পতিত হবে। গুনাহ্গার মুসলমান ব্যক্তিদের কেউ কেউ জাহান্নামে পতিত হবে। আর কোন কোন কম গুনাহ্গার অতি কষ্টে সিরাত অতিক্রম করবে। সিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য।

এ পাঠ থেকে আমরা সিরাতের অর্থ ও গুরুত্ব জানলাম। আমরা সিরাতকে সত্য বলে বিশ্বাস করব।

مِيزَانٌ (مِيزَانُ)

মীযান (مِيزَانُ) অর্থ মানদণ্ড, তুলাদণ্ড, দাঁড়িপাল্লা, পরিমাপক যন্ত্র। শরীআতের পরিভাষায় এমন একটি পরিমাপক যন্ত্রকে মীযান বলা হয় যার দ্বারা কিয়ামতের দিন আমল পরিমাপ করা হবে। এ মীযানের দুইটি পাল্লা ও মাঝে একটি দণ্ড থাকবে। মানুষের সকল আমল এতে ওজন করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝

অর্থ : “আর কিয়ামতের দিন আমি স্থাপন করব ন্যায্যবিচারের মানদণ্ড।” (আম্বিয়া ২১ : ৪৭)

মানুষের আমল তিল পরিমাপ ওজনের হলেও আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তা উপস্থিত করবেন এবং মীযানে তা ওজন করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।” (মু'মিনুন ২৩ : ১০২-১০৩)

আল্লাহ তাআলার প্রতি প্রশংসামূলক বাক্য কিয়ামতের দিন মীযানের পাতলাকে নেকী দ্বারা পূর্ণ করে দেবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন—**اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلِكُ الْمِيْزَانَ** “আল্ হাম্দুলিল্লাহ্ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বাক্যে নেকীর মীযান পূর্ণ হয়ে যায়।” (মুসলিম)। মহানবী (স) আরো বলেন— “এমন দুটি বাক্য আছে, যা করুণাময় আল্লাহর কাছে প্রিয়, উচ্চারণে সহজ, ওজন-দণ্ডে ভারী। বাক্য দুইটি হল—

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

অর্থ : “মহাপবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্য সকল প্রশংসা, তিনি মহামহিম।” (বুখারী)

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. মীযানের অর্থ ও গুরুত্ব। ২. কোন আমলে মীযান ভারী হয়ে যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব—

ক. তাওরাত

খ. যাবুর

গ. ইনজিল

ঘ. কুরআন

২। দুনিয়ার জীবনের কাজের ফল ভোগ করতে হবে—

ক. কবরে

খ. আখিরাতে

গ. জান্নাতে

ঘ. হাশরে

৩। কাফির জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী। কারণ সে—

ক. দুনিয়ার সুখ-শান্তি ভোগ করে

খ. দ্বিমুখী আচরণ করে

গ. আল্লাহকে অস্বীকার করে

ঘ. কবির গুনাহ করে

৪। তাকদীরের প্রতি ঈমান—

i. মনে শান্তি বয়ে আনে

ii. আল্লাহর উপর নির্ভরতা বাড়িয়ে তোলে

iii. শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৫, ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাবুল বহু উপাস্যের আরাধনা করে। সে প্রায়ই মুসলিম বন্ধুদের কাছ থেকে ইসলাম শিক্ষা বই নিয়ে পড়ে। এতে তার ইসলাম সম্পর্কে ভাল ধারণা জন্মে। সে বুঝতে পারে, বহু উপাস্যের আরাধনা না করে এক উপাস্যের আরাধনা করা উচিত।

৫। বাবুল বহু উপাস্যের আরাধনা করত, অতএব, তখন বাবুল ছিল—

ক. কাফির

খ. ফাসিক

গ. মুনাফিক

ঘ. মুশরিক

৬। ইসলাম শিক্ষা বইটি পড়ায় বাবুলের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে—

- | | |
|---------------|---------------------|
| ক. সত্য ধারণা | খ. পরমত সহিষ্ণুতা |
| গ. ধার্মিকতা | ঘ. অসাম্প্রদায়িকতা |

৭। বহু উপাস্যের আরাধনা না করে এক উপাস্যের আরাধনা করা উচিত, এতে প্রমাণিত হয় বাবুল—

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ক. ঈমান এনেছে | খ. তাকওয়া অর্জন করেছে |
| গ. তাওহীদে বিশ্বাস করেছে | ঘ. রিসালাতে বিশ্বাস করেছে |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কবির আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং বলে সব কিছুই আপনি সৃষ্টি হয়েছে। সজীব তাকে বলে, তুমি কিন্তু কুফর করছ। তুমি কুরআন হাদীস পড়লে তোমার ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর কবিরকে জিজ্ঞেস করে, এই কলেজ বিল্ডিংটি কি এমনি এমনি হয়েছে? কবির উত্তর দেয়, না। সজীব বলল, তাহলে বাসায় গিয়ে চিন্তা কর—এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য এমনি এমনি হতে পারে কি না। আল্লাহ বলেছেন, “যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া একাধিক ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।”

- ক. কুফর শব্দের অর্থ কী ?
 খ. কুফরের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
 গ. কবির কীভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে মজবুত করতে পারে ?
 ঘ. “যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া একাধিক ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত”—আয়াতটি ব্যাখ্যা কর।

২। সুমাইয়া, আরিফ এবং তাদের বাবা-মা পারিবারিকভাবে ঘরে বসে আলোচনা করছিল। আরিফ বলল, কী বিশ্বাস থাকলে আমরা জান্নাতে যেতে পারি? সুমাইয়া বলল, আমরা যদি ঈমান মুফাস্সাল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং সে অনুযায়ী কাজ করি তাহলে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে পৌঁছতে পারব।

- ক. ঈমান মুফাস্সালে কয়টি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে ?
 খ. ঈমান মুফাস্সাল—এর তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান— বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।
 গ. অনুচ্ছেদের আলোকে আরিফ কীভাবে জান্নাতে যেতে পারে ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. ঈমান মুফাস্সাল, ঈমানের মূল বিষয়গুলোকে একত্র করেছে— উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৩। সাধারণত দুনিয়াতে অনেক অপরাধীর শাস্তি হয় না। আবেদ ভাবছে তাদের কি কোন দিনই শাস্তি হবে না? সে তার শিক্ষককে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, দুনিয়াতে অনেক অপরাধীর শাস্তি হয়, আবার অনেকের হয় না। কিন্তু আখিরাতে মানুষকে তার অপরাধের ফল ভোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, “কিয়ামতের দিন আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড।” এ কথা শুনে আবেদের মনে আখিরাতে প্রতি ভয় জন্মে।

- ক. আখিরাতে কী ?
 খ. আখিরাতে উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় কেন ?
 গ. আখিরাতে ভয় আবেদের জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. “কিয়ামতের দিন আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড”— আয়াতটি বুঝিয়ে লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(عِبَادَةُ) ইবাদাত

ইবাদাত (الْعِبَادَةُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ দাসত্ব, উপাসনা, বন্দেগী, আনুগত্য ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ইবাদাত হচ্ছে ইসলামের আবশ্যকীয় অনুষ্ঠানাদি। যেমন- সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি। ব্যাপক অর্থে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পন্থায় জীবন অতিবাহিত করাকেই ইবাদাত বলে। যেমন- আল্লাহ বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ : “জিন ও মানুষ জাতিকে আমি একমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।” (যারিয়াত ৫১ : ৫৬)

(إِقَامَةُ الصَّلَاةِ) ইকামাতুস সালাত

ইকামাতুন আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা, স্থিতিশীল করা। শরীআতের পরিভাষায় ‘ইকামাতুস সালাত’ অর্থ হল নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় শর্ত ও নিয়ম মেনে সালাত আদায় করা।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَقِمُوا الصَّلَاةَ

অর্থ : “তোমরা সালাত কয়েম কর।” এখানে আল্লাহ সালাতকে শুধু পড়তে বলেননি, কয়েম করতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

অর্থ : “নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত কয়েম করা মুমিনের জন্য ফরয। (নিসা ৪ : ১০৩)

এ সম্পর্কে নবী কারীম (স) বলেন—

الصَّلَاةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ—

অর্থ : “সালাত জান্নাতের চাবি।” তিনি আরও বলেন—

الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكَافِرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

অর্থ : “মুমিন বান্দা এবং কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত বর্জন করা।” (মুসলিম)

মহানবী (স) সাত বছর বয়সে ছেলেমেয়েদের সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়ার জন্য এবং দশ বছর বয়সে তা আদায় না করলে তাদের শাসন করার জন্য অভিভাবকদের আদেশ দিয়েছেন।

সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল সালাত। সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে। দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সঠিকভাবে আদায় করলে মানুষ পাপ থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।”

(আনকাবূত ২৯ : ৪৫)

নবী কারীম (স) বলেন, “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে।” (তাবারানী)

সালাত বিনা ওযরে কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করা যায় না। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে নিয়ম অনুসারে সঠিক সময়ে সালাত আদায় করার জন্য শরীআতে তাকিদ রয়েছে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সালাতের নিয়ম ও সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের যে নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং তা আদায় করার জন্য যে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে সেগুলো সঠিকভাবে পালন করে সালাত আদায় করতে হবে। নির্ধারিত সময় ও নিয়ম ব্যতীত আদায় করলে সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ পাঠ থেকে আমরা জানলাম

১. ইকামাতুস সালাতের অর্থ।

২. ইকামাতুস সালাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব।

আমরা নির্দিষ্ট সময়ে যথানিয়মে সালাত আদায় করব। আল্লাহ আমাদের প্রতি খুশি হবেন। আমাদের জীবন সুন্দর হবে, পরকালে জান্নাত পাব।

(جَمَاعَةً) জামাআত

জামাআত অর্থ দল। ইসলামের পরিভাষায় একজন ইমাম ও অন্যান্য লোক মুক্তাদী হয়ে একত্রে সালাত আদায় করাকে জামাআত বলা হয়।

জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব

শরীআতে জামাআতের সাথে ফরয সালাত আদায়ের তাকিদ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَازْكِعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ ۝

অর্থ : “তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।” (বাকারা ২ : ৪৩) অর্থাৎ জামাআতবন্দ্ব হয়ে সালাত আদায় কর। নবী কারীম (স) জামাআত সম্পর্কে বলেছেন, “একাকী সালাত আদায় অপেক্ষা জামাআতে আদায় করলে সাতাশগুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।” (বুখারী ও মুসলীম)।

জামাআতে সালাত আদায়কারীকে নবী কারীম (স) খুবই পছন্দ করতেন। তিনি নিজে কখনও জামাআত ত্যাগ করেন নি। কেউ জামাআতে শরীক না হলে তিনি খোঁজ নিতেন এবং এতে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন।

জামাআতবন্দ্ব হয়ে সালাত আদায় করার সামাজিক গুরুত্ব অনেক। একজন ইমামের পেছনে সালাত আদায় অর্থ নেতাকে অনুসরণ বুঝায়। জামাআতে সালাত আদায়ের বেলায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকে না। রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব, ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত একই কাতারে দাঁড়ায়। এতে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন ঘটে। আমরা মানুষ, আমাদের সবাইকে একই অবস্থায় আল্লাহর নিকট যেতে হবে। জামাআতে সালাতের মাধ্যমে এরই শিক্ষা পাওয়া যায়। দৈনিক পাঁচবার জামাআতে সালাত আদায় করার ফলে পরস্পরের খোঁজ-খবর নেওয়া সহজ হয়। বিপদে আপদে একে অন্যের সাহায্য করা সম্ভব হয়। জামাআতে সালাত আদায়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হয়।

আমরা জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করব। জামাআতে সালাত আদায় করব।

(الْمُقْتَدِي) মুক্তাদী

ইমামের পেছনে তাঁকে অনুসরণ করে যারা সালাত আদায় করে তাদের মুক্তাদী বলা হয়। মুক্তাদী এই বলে সালাতের নিয়্যাত করবে যে, আমি এই ইমামের পেছনে সালাত আদায় করছি। সালাতের যাবতীয় কাজে মুক্তাদীকে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। তবে মুক্তাদীকে সূরা কিরাআত পড়তে হবে না। মুক্তাদীগণ ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। যদি

মুক্তাদী একজন হয় তবে ইমামের ডান দিকে কিছুটা পেছনে দাঁড়াবে।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. জামাআতে সালাত আদায়ের পদ্ধতি।

২. মুক্তাদীর পরিচয় ও করণীয়।

আমরা নিয়মিত জামাআতে সালাত আদায় করব। এতে অনেক বেশি সাওয়াব পাব। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

মাসবূকের সালাত (صَلَاةُ الْمَسْبُوقِ)

যে ব্যক্তি সালাতে এক বা একাধিক রাকাআত শেষ হওয়ার পর ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হয় তাকে মাসবূক বলে।

মাসবূকের সালাত আদায়ের নিয়ম

মুসল্লী সালাত আদায় করতে গিয়ে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থাতেই নিয়্যাত করে সালাতে शामिल হবে। তারপর ইমামের সাথে যথারীতি রুকু সিজদা করে তাশাহুদ পাঠের জন্য বসে যাবে। ইমাম সালাম ফিরালে সে সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া রাকাআতে আউযুবিলাহ, বিস্মিল্লাহ পড়ার পর সূরা ফাতিহার সংগে অন্য একটি সূরা পড়বে। এরপর রুকু, সিজদা করে যথারীতি তাশাহুদ, দরুদ, দুআ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।

যদি মুক্তাদী ইমামকে শেষ বৈঠকে পায় তবে ইমাম সালাম ফিরালে সে যথারীতি ওপরে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে ছুটে যাওয়া অংশ আদায় করবে। অর্থাৎ একাকী সালাত আদায় করলে যেভাবে আদায় করতে হয় ঠিক সেভাবেই সালাত শেষ করবে। রুকুসহ ইমামের সাথে যে কয় রাকাআত পাওয়া যায় তা আদায় হয়ে যায়। রুকুর পর ইমামের পেছনে ইত্তিদা করলে ঐ রাকাআত মাসবূককে আদায় করতে হবে।

মুসাফিরের সালাত (صَلَاةُ الْمُسَافِرِ)

মুসাফিরের সংজ্ঞা

মুসাফির আরবি শব্দ। এর অর্থ ভ্রমণকারী। কোন ব্যক্তি কমপক্ষে ৪৮ মাইল দূরবর্তী কোন স্থানে যাওয়ার নিয়্যাত করে বাড়ি থেকে বের হলে শরীআতের পরিভাষায় তাকে মুসাফির বলে। মুসাফির গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কমপক্ষে পনের দিন অবস্থানের নিয়্যাত না করা পর্যন্ত তার জন্য মুসাফিরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। শরীআতে মুসাফিরকে সংক্ষিপ্ত আকারে সালাত আদায়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সংক্ষিপ্তকরণকে আরবিতে কসর বলা হয়।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۝

অর্থ : “যখন তোমরা দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই।” (নিসা ৪ : ১০১)। মুসাফিরের সালাত সম্পর্কে নবী কারীম (স) বলেছেন, “এটি একটি সাদাকা, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের (মুসাফিরদের) দান করেছেন। এ সাদাকা তোমরা গ্রহণ কর।” (বুখারী ও মুসলিম)

মুসাফিরের সালাত আদায়ের নিয়ম

মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাআতবিশিষ্ট যুহর, আসর ও ইশার ফরয সালাত দুই রাকাআত করে পড়বে। ফজর, মাগরিব ও

বিত্রের সালাতে কসর নেই। এগুলো পুরোপুরি আদায় করতে হবে।

আল্লাহর দেওয়া সকল সুযোগ সুবিধা খুশি মনে গ্রহণ করা উচিত। কাজেই কোন মুসাফির ব্যক্তি যদি ইচ্ছে করে যুহর, আসর বা ইশার সালাতে ফরয চার রাকাআত আদায় করে, তবে আল্লাহর দেওয়া সুযোগ গ্রহণ না করায় গুনাহগার হবে।

(صَلَوةُ الْمَرِيضِ) রুগ্ন ব্যক্তির সালাত

রুগ্ন ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম

রুগ্ন ব্যক্তিকে হুঁশ থাকা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে হবে। রোগ যত কঠিনই হোক না কেন, সম্পূর্ণরূপে অপারগ না হলে সালাত ত্যাগ করতে পারবে না। দাঁড়াতে কষ্ট হলে বসে রুকু সিজদার সাথে সালাত আদায় করবে। রুকু সিজদা করতে অক্ষম হলে বসে ইশারায় সালাত আদায় করবে। ইশারা করার বেলায় রুকু অপেক্ষা সিজদায় মাথা একটু বেশি নত করবে। ইশারা মাথা দিয়ে করতে হবে, চোখে ইশারা করলে সালাত আদায় হবে না।

রুগ্ন ব্যক্তিকে বসার সময় নামাযের অবস্থায় বসতে হবে। যদি রোগী এতই দুর্বল হয় যে, বসে থাকা সম্ভব নয়, তবে কিবলার দিকে পা চিৎ হয়ে শুয়ে ইশারায় রুকু ও সিজদা করবে অথবা উত্তর দিকে মাথা রেখে কাত হয়ে শোয়ে এবং কিবলার দিকে মুখ রেখে ইশারায় সালাত আদায় করবে। যদি এভাবেও সালাত আদায় করা সম্ভব না হয় তবে তার ওপর সালাত আর ফরয থাকে না, মাকফ হয়ে যায়।

এ অপারগ অবস্থায় যদি চব্বিশ ঘণ্টা সময় অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বা তার চেয়ে কম সময় অতিক্রান্ত হয় তাহলে সক্ষম হওয়ার পর রুগ্ন ব্যক্তিকে কাযা করতে হবে। যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশি সময় অতিবাহিত হয় তবে আর কাযা করতে হবে না। যদি কোন ব্যক্তি বেহুঁশ হয়ে পড়ে এবং এ অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্তের বেশি সালাত ছুটে যায় তবে তার এগুলো কাযা করতে হবে না, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত বেহুঁশ থাকলে অবশ্যই সুস্থ হওয়ার পর কাযা করতে হবে।

(صَلَوةُ الْجُمُعَةِ) জুমুআর সালাত

শুক্রবার যুহরের ওয়াক্তে যুহরের সালাতের পরিবর্তে যে সালাত আদায় করা হয় তাকে বলা হয় জুমুআর সালাত। প্রতি শুক্রবার জামে মসজিদে জুমুআর জামাআত অনুষ্ঠিত হয়।

গুরুত্ব

জুমুআর সালাত ফরয। এর অস্বীকারকারী কাফির। অবহেলা করে কেউ এ সালাত আদায় না করলে সে ফাসিক হয়ে যাবে। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, মুসলিম পুরুষের ওপর জুমুআর সালাত ফরজ। আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

অর্থ : “হে মুমিনগণ। জুমুআর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটি তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।” (জুমুআ ৬২ : ৯)

ফযীলাত

জুমুআর সালাতের ফযীলাত অনেক। নবী কারীম (স) বলেন, “যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য গমন করে, তার প্রতি পদক্ষেপে এক বৎসরের নফল রোযার সাওয়াব দেওয়া হবে।” (তিরমিযী)

নবী কারীম (স) আরো বলেন, “যে ব্যক্তি শুব্বারের গোসল করে যথাসম্ভব পাক সাফ হয়ে খোশবু লাগিয়ে জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায়, মসজিদে গিয়ে কাউকে কষ্ট না দিয়ে যেখানে জায়গা পায় সেখানেই বসে যায়, যথাসম্ভব সালাত আদায় করে এবং নীরবে বসে মনোযোগ সহকারে খুত্বা শোনে, আল্লাহ তাআলা তার বিগত জুমুআ হতে এ জুমুআ পর্যন্ত সকল (সগীরা) গোনাহ মাফ করে দেবেন।” (বুখারী)

জুমুআর সালাত আদায় না করলে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। নবী কারীম (স) বলেন, “যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পর পর তিন জুমুআ ত্যাগ করে, তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয় এবং তার দিলকে মুনাফিকের অন্তরে পরিণত করে দেওয়া হয়।” (তবারাগী)

তাৎপর্য

জুমুআর সালাতের ফযীলাত অনেক। জুমুআর সালাতে এলাকার লোকজন একত্রিত হয়। পরস্পর দেখা-সাক্ষাত হয়। পরস্পরের কুশলাদি জানা যায়। সুখে দুঃখে একে অন্যের সাহায্য সহযোগিতা করার সুযোগ হয়। মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

জুমুআর সালাত আদায়ের নিয়ম

জুমুআর দুই রাকাত সালাত ফরয। ফরযের আগে চার রাকাত কাব্বল জুমুআ ও পরে চার রাকাত বা'দাল জুমুআ সুন্নাত। জুমুআর ফরযের জন্য জামাতাত শর্ত। জামাতাত ছাড়া জুমুআ হয় না। কোন কারণে জুমুআতে शामिल হতে না পারলে যুহরের সালাত আদায় করতে হয়। কাজেই জুমুআর সালাত যুহরের ওয়াক্তই পড়তে হবে।

জুমুআর জন্য দুইটি আযান দেওয়া হয়। প্রথম আযান মসজিদের বাইরে মিনারায়, দ্বিতীয়টি মসজিদের ভেতরে ইমাম সাহেব খুত্বা দিতে মিম্বরে বসলে দেওয়া হয়। জুমুআর দুই রাকাত ফরযের পূর্বে ইমাম সাহেব মুসল্লীদের উদ্দেশে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুত্বা দেন। খুত্বা শোনা ওয়াজিব। এ সময় কথা বলা, অন্য কোন সালাত আদায় করা নিষেধ। খুত্বা শেষে ইমামের সাথে দুই রাকাত ফরয সালাত অন্যান্য ফরয সালাতের ন্যায় আদায় করতে হয়।

এ পাঠ থেকে আমরা জানলাম

১. জুমুআর সালাতের পরিচয়।
২. জুমুআর সালাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব।
৩. জুমুআর সালাত আদায়ের শর্তাবলি।
৪. জুমুআর সালাত আদায়ের নিয়ম।

আমরা নিয়মিত জুমুআর সালাত আদায় করব। আমরা অনেক নেকী পাব। অবহেলা করে কখনও এ সালাত ত্যাগ করব না।

ঈদের সালাত (صَلَاةُ الْعِيدِ)

ঈদ অর্থ আনন্দ, উৎসব। ঈদের দিন হল মুসলমানদের জাতীয় খুশির দিন। মহানবী (স) বলেছেন, “প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন আছে। আর আমাদের উৎসব হল ঈদ।” (বুখারী ও মুসলিম)

বছরে দুইটি ঈদ। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ঈদের দিন সারা এলাকার মুসল্লীরা ঈদগাহে একত্রিত হন। দুই রাকাত ঈদের সালাত আদায় করে আল্লাহর শোক্‌রিয়া জানান। ঈদের সালাত আদায় করা ওয়াজিব। এতে ছয়টি তাকবীর অতিরিক্ত দিতে হয়।

(عِيدُ الْفِطْرِ) ঈদুল ফিতর

তাৎপর্য

ঈদ মানে আনন্দ। আর ফিতর অর্থ সাওম ভঙ্গ করা। ঈদুল ফিতর অর্থ সাওম ভঙ্গের আনন্দ। রমযানের পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন মুসলমানগণ এ উৎসব পালন করেন। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের ওপর রমযান মাসে যে ইবাদাত নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন তা পালন করার তাওফীক দান করায় মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে এদিন শোকরিয়া জানান। ঈদের সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

গুরুত্ব

এদিন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের খোঁজ-খবর নিতে হয়। ধনীদের ওপর এদিন সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। এতে গরিব মিসকীন সকলে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারে। সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

ঈদুল ফিতরের দিন দুইটি কাজ ওয়াজিব ১. ফিতরা দেওয়া, ২. ঈদের দুই রাকাত সালাত আদায় করা।

ঈদের দিনে সুন্নাত কাজ

১. গোসল করা।
২. খোশবু লাগানো।
৩. পরিষ্কার কাপড় পরা।
৪. সালাত আদায়ের পূর্বে মিষ্টিজাতীয় কিছু খাওয়া।
৫. ময়দানে গিয়ে ঈদের সালাত আদায় করা।
৬. ঈদগাহে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে তাকবীর বলতে বলতে যাওয়া।

ঈদের তাকবীর

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ○

(عِيدُ الْأَضْحَى) ঈদুল আয্হা

তাৎপর্য

যিলহাজ্জ মাসের দশম তারিখে এ উৎসব পালন করা হয়। এ উৎসব এক বিরাট কুরবানীর স্মৃতি বহন করে। আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহীম (আ) আল্লাহর ইজ্জিতে তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আ) কে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। পুত্র ইসমাইল (আ) ও এটাই আল্লাহর ইচ্ছা জানতে পেরে আনন্দিত চিণ্ডে ধারাল ছুরির নিচে মাথা পেতে দিলেন। এ স্মৃতি রক্ষার্থে মুসলমানগণ প্রতি বছর কুরবানী করে থাকেন। কুরবানীর অতুলনীয় ইতিহাস স্মরণ করে মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে এ দিন শপথ করেন যে, হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্যে যেভাবে আমরা পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, প্রয়োজনে তেমনিভাবে আমরা নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করতে ও জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হব না।

গুরুত্ব

আর্থিক সংগতিসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। কুরবানীর মাধ্যমে মুসলমানের ঈমান ও তাকওয়ার পরীক্ষা হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আল্লাহর নিকট সেগুলোর (কুরবানীর পশুর) গোশত এবং রক্ত পৌছায় না, পৌছায় তোমাদের তাকওয়া।” (হাজ্জ ২২ : ৩৭)

মহানবী (স) বলেন, “কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা কবুল হয়ে যায়।” (তিরমিযী)। তিনি আরো বলেন, “কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি পশমের জন্য একটি করে সাওয়াব পাওয়া যায়।” (ইবনে মাজাহ)। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও অশেষ নেকী পাওয়ার জন্য খুশি মনে কুরবানী করব।

কুরবানীর গোশত তিনভাগ করে একভাগ নিজের জন্য রাখা, একভাগ আত্মীয় প্রতিবেশী ও একভাগ গরিব মিস্কিনকে দেওয়া উত্তম। এতে ধনীদের সাথে গরিবরাও ঈদের আনন্দে অংশীদার হওয়ার সুযোগ পাবে।

ঈদুল আযহার ওয়াজিব দুইটি

১. ঈদের দুই রাকাআত সালাত আদায় করা।

২. কুরবানী করা।

ঈদুল আযহার সুন্নাত ঈদুল ফিত্রের মত। কেবল পার্থক্য এতটুকু যে, ঈদুল ফিত্রের দিন সালাতের আগে আর ঈদুল আযহার দিন সালাত ও কুরবানীর পর কিছু খাওয়া সুন্নাত।

ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম

ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করা যায়।

প্রথমে কাতার করে নিয়্যাত করব। তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধব। সানা পড়ব। তারপর ইমাম সাহেবের সাথে অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলব। প্রত্যেক তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠাব। প্রথম দুই তাকবীরে হাত বাঁধব না। তৃতীয় তাকবীরে অন্যান্য সালাতের ন্যায় হাত বাঁধব। তারপর ইমাম সাহেব স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম রাকাআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকাআতের রুকুতে যাবার পূর্বে অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবেন। আমরাও তাঁর সাথে তাকবীর বলব, তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেব, হাত বাঁধব না। চতুর্থ তাকবীরে রুকুতে যাব। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে সালাত শেষ করব। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুইটি খুত্বা দেবেন। খুত্বা শোনা ওয়াজিব।

ঈদের ময়দানে যাবার পথে ঈদুল আযহার তাকবীর ঈদুল ফিত্রের তাকবীরের অনুরূপ। ঈদুল ফিত্রের দিন এই তাকবীর আস্তে এবং ঈদুল আযহার দিন জোরে পড়তে হয়।

যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখ ফজর থেকে তের তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে এই তাকবীর পড়া ওয়াজিব। এ তাকবীরকে তাকবীরে তাশরীক বলা হয়।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহার পরিচয়।

২. ঈদের তাৎপর্য ও গুরুত্ব।

৩. ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম।

উপরোক্ত নিয়মে আমরা সকলে মিলে উৎসব পালন করব। আমাদের জীবন সুন্দর হবে।

(صَلَاةُ الْجَنَازَةِ) জানাযার সালাত

পরিচয়

মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কবরস্থ করার পূর্বে চার তাকবীরসহ যে সালাত আদায় করা হয় তাকে জানাযার সালাত বলা হয়। জানাযার সালাত ফরযে কিফায়া। কিছু সংখ্যক লোক এ সালাত আদায় করলেই সকলের ফরয আদায় হয়ে যায়। কেউ আদায় না করলে এলাকার সকলকেই গুনাহগার হতে হয়। এ সালাতে বুকু সিজদাহ নেই।

তাৎপর্য ও গুরুত্ব

মানুষ মরণশীল। প্রত্যেককেই একদিন না একদিন মরতে হবে। মৃত ব্যক্তিদের প্রতি জীবিতদের অনেক কর্তব্য আছে। মৃতকে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো, তার ওপর জানাযার সালাত আদায় করা এবং সবশেষে তাকে কবরস্থ করা আমাদের জরুরি কর্তব্য। মূলত জানাযার সালাত হল মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ। যত বেশি লোক একত্রিত হয়ে দুআ করবে ততই তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ জন্য জানাযার সালাতে লোক যত বেশি হবে ততই ভাল। অধিক লোক একত্রিত করার জন্য মৃত্যুর সংবাদ চারদিকে প্রচার করা উচিত।

জানাযার সালাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। আব্বাহর নিকট একদিন আমাদের আবার যে ফিরে যেতে হবে, এ সালাত সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। জানাযার মাধ্যমে মানুষের প্রতি মানুষের সহর্মিতার প্রকাশ পায়।

জানাযার সালাত আদায়ের নিয়ম

মৃতকে গোসল করিয়ে কাফন পরানোর পর ইমাম মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে তার বুক বরাবর দাঁড়াবেন। আমরা ইমামের পেছনে দাঁড়াব। তারপর মনে মনে নিয়্যাত করব—

“আমি কিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পেছনে চার তাকবীরের সাথে জানাযার সালাত আদায় করছি।”

তারপর প্রথম তাকবীর বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত বাঁধব। পরে সানা পড়ে হাত বাঁধা অবস্থাতেই ইমামের সাথে দ্বিতীয় তাকবীর বলব। তারপর দরূদ শরীফ পড়ে ইমামের সাথে তৃতীয় তাকবীর বলব। তারপর নিম্নের দুআটি পড়ব—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا
وَأَنْثُنَا— اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ. وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا
فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ ○

এই দুআ পড়ে চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব। তাকবীর বলার সময় হাত উঠাব না। মৃত যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক হয়, তবে তৃতীয় তাকবীরের পর নিম্নের দুআটি পড়ব—

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا ○

মাইয়েত অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকা হলে পড়ব—

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً
وَمُشَفَّعَةً ○

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় পড়ব—

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ○

কবরের ওপর মাটি দেওয়ার সময় পড়ব—

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. জানাযার সালাতের পরিচয়।
২. জানাযার তাৎপর্য ও গুরুত্ব।
৩. জানাযার সালাত আদায়ের নিয়ম।

আমরা জানাযার সালাতে शामिल হব। মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করব।

সুন্নাত ও নফল সালাত

আমরা প্রতিদিন যে সালাত আদায় করি নিচের ছকে এর বর্ণনা দেওয়া হল—

ওয়াক্ত	সুন্নাত	ফরয	সুন্নাত	ওয়াজিব
ফজর	২ রাকাআত	২ রাকাআত		
যুহর	৪ রাকাআত	৪ রাকাআত	২ রাকাআত	
আসর		৪ রাকাআত		
মাগরিব		৩ রাকাআত	২ রাকাআত	
ইশা		৪ রাকাআত	২ রাকাআত	৩ রাকাআত

ছকে বর্ণিত ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া বার রাকাআত সালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। নবী কারীম (স) নিজে তা আদায় করতেন এবং অন্যকেও তা আদায়ে উৎসাহিত করতেন। তিনি এর ফযীলাত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, “যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকাআত সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করে রাখবেন।” (মুসলিম)

এছাড়াও কিছু সুন্নাত ও নফল সালাত আছে, যার বর্ণনা পরে দেওয়া আছে।

তারাবীহের সালাত (صَلَوةُ التَّرَاوِيحِ)

রমযান মাসে ইশার সালাতের পর বিত্রের পূর্বে যে সালাত আদায় করতে হয় তাকে তারাবীহের সালাত বলে। এ সালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। নবী কারীম (স) নিজে এ সালাত আদায় করেছেন ও সাহাবীগণকে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। সুন্নাত সালাতে জামাআতের বিধান নেই। তবে তারাবীহ সালাত জামাআতে আদায় করা সুন্নাত। এ সালাত মোট বিশ রাকাআত।

তারাবীহ সালাত আদায়ের নিয়ম

রমযান মাসের ইশার ফরয ও দুই রাকাআত সুন্নাতের পর বিত্রের পূর্বে তারাবীহের নিয়্যাতে দুই রাকাআত করে মোট বিশ রাকাআত এ সালাত আদায় করতে হয়। প্রতি চার রাকাআত অন্তর বসে বিশ্রাম নিতে হয়।

তখন নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া উত্তম—

سُبْحَانَ ذِي الْمَلَكُوتِ وَالْمَلَكُوتِ - سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعِزَّةِ وَالْهَيْبَةِ
وَالْقُدْرَةِ وَالْكَبَرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ - سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا
يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ۝

তারাবীহের সালাত শেষ করে বিত্রের সালাত জামাআতে আদায় করতে হয়।

তারাবীহের সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলাত

পবিত্র রমযান মাস রহমতের মাস, বরকতের মাস। পাপ থেকে মুক্তি পাবার শ্রেষ্ঠ সময় হল রমযান মাস। সারাদিন সাওম পালনের পর বান্দা যখন ক্লান্ত শরীরে তারাবীহের বিশ রাকাত সালাত আদায় করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে, তখন আল্লাহ সে বান্দার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন। বান্দার জন্য এমন সুযোগ বছরে মাত্র একবারই আসে। তাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর রহমত পেতে ব্রতী হয়।

রমযান মাসে তারাবীহের সালাতে একবার কুরআন খতম করা উত্তম। নবী কারীম (স) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে আখিরাতের প্রতিদানের আশায় রমযানের রাতে তারাবীহের সালাত আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।” (বুখারী)

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. তারাবীহের সালাতের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলাত।

২. তারাবীহের সালাত আদায়ের নিয়ম।

আমরা পবিত্র রমযানে নিয়মিত তারাবীহের সালাত জামাআতে আদায় করব। তাতে আল্লাহ খুশি হবেন। আমরা অনেক বেশি সাওয়াব পাব।

তাহাজ্জুদের সালাত (صَلَاةُ التَّهَجُّدِ)

তাহাজ্জুদের সালাত পড়া সুন্নাত। এর গুরুত্ব অপরিমিত।

নবী কারীম (স) প্রতিনিয়ত এ সালাত আদায় করতেন এবং সাহাবীগণকেও আদায়ের জন্যে উৎসাহিত করতেন। কুরআন মাজীদে এ সালাত সম্পর্কে বিশেষভাবে তাকিদ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা নবী কারীম (স) কে সম্বোধন করে বলেন—

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۝

অর্থ : “রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করুন। এ সালাত আপনার জন্য অতিরিক্ত।” (বনি ইসরাঈল ১৭ : ৭৯)

নবী কারীম (স) বলেন, “ফরয সালাতের পর সবচাইতে উৎকৃষ্ট হল তাহাজ্জুদের সালাত।” (মুসলিম)

গুরুত্ব

গভীর রাতে আরামের ঘুম ত্যাগ করে বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য ও রহমত পাবার আশায় তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে তখন আল্লাহ খুবই খুশি হন। তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে বান্দার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এ সালাত

আদায়ে পুণ্যময় জীবনের পথ প্রশস্ত হয়।

আমরা নিয়মিত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে চেষ্টা করব। এতে আল্লাহ আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করবেন।

সময় ও আদায়ের নিয়ম

তাহাজ্জুদের সালাত রাতের শেষার্ধ্বে পড়া উত্তম। এ সালাত আট রাকাআত পড়া সুন্নাত। তবে ইশার পর কমপক্ষে দুই রাকাআত পড়লেও চলবে।

এ সালাত দুই রাকাআত করে পড়তে হয় এবং সুন্নাত সালাতের নিয়মেই আদায় করতে হয়। তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে কয়েকবার দরূদ শরীফ পাঠ করা উত্তম। এরপর বিত্রের সালাত আদায় করা উত্তম।

(صَلَوةُ الْإِشْرَاقِ) সালাতুল ইশ্রাক

ইশ্রাকের সালাত সুন্নাতে যায়িদা বা নফল। এ সালাতে রয়েছে অনেক ফযীলাত। হাদীস শরীফে এর ফযীলাত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইশ্রাকের সালাত দুই রাকাআত করে দুইবারে চার রাকাআত পড়তে হয়।

সময়

ইশ্রাকের সালাত ফজরের পরে আদায় করতে হয়। ফজরের সালাত আদায় করে বিছানাতে বসে কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ, তাহলীল ও দরূদ পাঠরত অবস্থায় থাকা এবং এ সময়ে কথাবার্তা বা কাজকর্ম না করাই উত্তম। তারপর সূর্য সম্পূর্ণরূপে উঠে গেলে এ সালাত আদায় করতে হয়।

যদি কেউ ফজরের সালাতের পর দুনিয়ার কোন আবশ্যকীয় কাজকর্ম করে এ সালাত আদায় করে তবে তাও আদায় হবে। তবে সাওয়াব কম হবে।

আমরা আল্লাহর নৈকট্য ও অধিক পুণ্য লাভের আশায় এ সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হব।

(صَلَوةُ الْآوَابِيْنِ) সালাতুল আওয়াবীন

এ সালাতও সুন্নাতে যায়িদা। হাদীসে আওয়াবীন সালাতের অনেক ফযীলাত বর্ণিত আছে। এ সালাত নিয়মিত আদায় করলে অনেক নেকী পাওয়া যায়।

সময় ও আদায়ের নিয়ম

সালাতুল আওয়াবীন মাগরিবের ফরয ও দুই রাকাআত সুন্নাতের পর থেকে ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়। আওয়াবীনের সালাত দুই রাকাআত করে ছয় রাকাআত পড়তে হয়।

আমরা অধিক সাওয়াবের আশায় এ সুন্নাত সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হব।

আসর ও ইশার ফরযের পূর্বের সুন্নাত সালাত

আসরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাআত সালাত আদায় করা সুন্নাতে যায়িদা। নবী কারীম (স) এ সালাত আদায় করেছেন। ইশার ফরযের পূর্বেও চার রাকাআত সালাত আদায় করা উত্তম। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। আমরা অধিক সাওয়াবের আশায় এ সালাত আদায় করব। তবে এ সালাত আদায় না করলে পাপ হবে না।

সাওম (الصَّوْمُ)

ইসলামের পাঁচটি রুক্ন বা স্তম্ভের মধ্যে সাওম অন্যতম।

অর্থ

সাওম (الصَّوْمُ) অর্থ বিরত থাকা। শরীআতের পরিভাষায় সুব্হি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাওয়াবের আশায় নিয়্যাতের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মুসলমানদের ওপর রমযান মাসের সাওম পালন ফরয। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ۝

অর্থ : “হে ঈমানদারগণ তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হল।” (বাকারা ২ : ১৮৩)

সাওম পালন করা ফরয। যে তা অস্বীকার করবে সে কাফির হবে। বিনা ওয়রে কেউ পালন না করলে সে ফাসিক ও গুনাহগার হবে।

সাওম প্রত্যেক শরীআতে ফরয ছিল। পূর্ববর্তী সকল উম্মাতের জন্য তা ছিল অপরিহার্য ইবাদাত। কুরআনুল কারীমে আছে—

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ۝

অর্থ : “যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ওপর।”

সাওমের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে নবী কারীম (স) বলেন, “যে ব্যক্তি কোন ওয়র বা রোগ ব্যতীত রমযানের একটি সাওম ছেড়ে দেবে, সে যদি সারা জীবন ধরে সাওম পালন করে তবুও তার ক্ষতি পূরণ হবে না।” (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

সাওম পালন করলে মানুষ পরস্পর সহানুভূতিশীল হয়। ধনীরা গরিবের অর্ধাহারে-অনাহারে জীবনযাপনের কষ্ট অনুধাবন করতে পারে। ফলে তারা দান খয়রাতে উৎসাহিত হয়। সাওম পালনের মাধ্যমে হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, ধূমপানে আসক্তি ইত্যাদি বদ অভ্যাস ত্যাগ করা সহজ হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে—

الصَّوْمُ وَجَنَّةٌ

অর্থ : “সাওম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ।” অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হল সাওম। সাওম পালনের মাধ্যমে পানাহারে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এতে অনেক রোগ দূর হয়। স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

উদ্দেশ্য

সাওমের মূল উদ্দেশ্য হল তাকওয়া অর্জন করা, পরহেযগার হওয়া। আল্লাহ বলেন—

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

অর্থ : “যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।” তাকওয়া মানে আল্লাহর ভয়। যার মনে আল্লাহর ভয় আছে সে কোন পাপ কাজ করতে পারে না, অন্যের ক্ষতি করতে পারে না।

ফযীলাত

সাওমের ফযীলাত অনেক। আল্লাহ তাআলা বলেন, “রমযান এমন একটি মাস, যে মাসে বিশ্বমানবের পথ নির্দেশক, তাদের জীবন পথের সুস্পষ্ট বিধানসমূহ, আর হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী কুরআন নাযিল করা হয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসটি পাবে সে যেন এ মাসে সাওম পালন করে।” (বাকারা ২ : ১৮৫)

এতে বুঝা যায় যে, রমযান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে এটি অতি পবিত্র মাস। রাসূল কারীম (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ ۝

অর্থ : “সাওম কেবল আমারই জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।” (বুখারী ও মুসলিম)

নবী কারীম (স) আরও বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আখিরাতে সাওয়াবের আশায় সাওম পালন করে, তার অতীত জীবনের সকল (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

এ মাস ধৈর্যের মাস। সবরের মাস। সবরের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। এ মাসে মুমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোন সাওম পালনকারীকে ইফতার করাবে সে তার সাওমের সমান সাওয়াব পাবে। অথচ সাওম পালনকারী ব্যক্তির সাওয়াবে বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবে না।

ফযীলাতের দিক দিয়ে রমযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং শেষ অংশ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার।

সাওমের প্রকারভেদ

সাওম ছয় প্রকার। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল ও মাকরুহ।

ক. ফরয সাওম : বছরে শুধু রমযান মাসের সাওম পালন করা ফরয এবং এর অস্বীকারকারী কাফির। রমযানের

সাওমের কাযাও ফরয। বিনা ওযরে এ সাওম ত্যাগকারী ফাসিক ও গুনাহগার হবে।

খ. ওয়াজিব সাওম : মানতের সাওম ওয়াজিব। কোন নির্দিষ্ট দিনে সাওম পালনের মানত করলে সেদিনেই পালন করা জরুরি।

গ. সুন্নাত সাওম : নবী কারীম (স) যে সকল সাওম নিজে পালন করেছেন এবং অন্যদের পালন করতে উৎসাহিত করেছেন সেগুলো সুন্নাত সাওম। আশুরার ও আরাফার দিনে সাওম পালন করা সুন্নাত।

ঘ. মুস্তাহাব সাওম : চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সাওম পালন করা মুস্তাহাব। সপ্তাহের প্রতি সোম ও বুধসপ্তিমবার এবং শাওয়াল মাসের ছয়টি সাওম পালন করা মুস্তাহাব।

ঙ. নফল সাওম : ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব ছাড়া সকল প্রকার সাওম নফল। যে সকল দিনে সাওম পালন মাকরুহ, ঐ সকল দিন ব্যতীত অন্য যে কোন দিন সাওম রাখা নফল।

চ. মাকরুহ সাওম

১. মাকরুহ তাহরীমী : যা কার্যত হারাম। যথা- দুই ঈদের দিনে ও যিলহাজ্জ চাঁদের ১১, ১২, ১৩ সাওম পালন করা।

২. মাকরুহ তানযীহী : যেমন, মুহাব্বারাম মাসের ৯ বা ১১ তারিখে সাওম পালন না করে শুধুমাত্র ১০ তারিখে পালন করা।

(السَّحَرِيُّ)

সাওম পালনের উদ্দেশ্যে সুবহি সাদিকের পূর্বে যে খাওয়া-দাওয়া করা হয় তাকে সাহরী বলে। সাহরী খাওয়া সুন্নাত। নবী কারীম (স) নিজে সাহরী খেতেন এবং অন্যদেরও খাওয়ার তাকিদ করতেন। তিনি বলেছেন, “সাহরী খাওয়া বরকতের কাজ। তোমরা সাহরী খাও।” (বুখারী ও মুসলিম)

ইফতার (أَفْطَارُ)

সূর্যাস্তের পর নিয়্যাতের সাথে কিছু পানাহারের মাধ্যমে সাওম সমাপ্ত করাকে ইফতার বলে। ইফতার করা সুন্নাত। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইফতার করার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে হয়—

اللَّهُمَّ لَكَ صُئِمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ۝

অর্থ : “হে আল্লাহ! আপনার জন্যে সাওম পালন করেছি এবং আপনার দেওয়া রিযিক দ্বারাই ইফতার করলাম।”

নিজে ইফতার করার সাথে সাথে অন্যকেও ইফতার করালে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। নবী কারীম (স) বলেন, “যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযাদারের সমান সাওয়াব পাবে।” (বায়হাকী)

আমরা অধিক সাওয়াব ও আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশায় নিজে ইফতার করব এবং অন্যকেও ইফতার করাব।

সাওম ভঙ্গের কারণ

যে সকল কারণে সাওম ভেঙ্গে যায় এবং একটির পরিবর্তে একটি সাওম পালন করা ফরয হয়—

১. ভুল বশত কিছু খেয়ে ফেলার পর সাওম ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে।
২. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে চলে গেলে।
৩. সাওম পালনকারীকে জোর করে কেউ কিছু পানাহার করালে।
৪. ভুল বশত রাত এখনও বাকি আছে মনে করে সুবহি সাদিকের পর সাহুরী খেলে।
৫. ইফতারের সময় হয়েছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বেই ইফতার করলে।
৬. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভর্তি বমি করলে।
৭. পেশাব পায়খানার রাস্তার মাধ্যমে ঔষধ বা অন্য কিছু ঢুকালে।

সাওম মাকরূহ হওয়ার কারণ

১. অন্যের গীবত অর্থাৎ দোষত্রুটি বর্ণনা করলে।
২. মিথ্যা কথা বললে, অশ্লীল আচরণ বা গালমন্দ করলে।
৩. কুলি করার সময় গড়গড়া করলে। কারণ এতে গলার ভেতর পানি ঢুকে গিয়ে সাওম ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে।
৪. যথাসময়ে ইফতার না করলে।
৫. গরমবোধে বারবার গায়ে ঠাড়া কাপড় জড়িয়ে রাখলে বা বারবার কুলি করলে।

সাওমের কাযা ও কাফফারা (قَضَاءُ الصَّوْمِ وَكَفَّارَتُهُ)

কাযা

কোন কারণে অনিচ্ছায় যদি সাওম ভেঙ্গে যায় কিংবা কোন ওযরে তা পালন না করা হয় তবে একটি সাওমের পরিবর্তে একটি সাওমই রাখতে হয়। একে কাযা সাওম বলে।

যে সকল কারণে সাওম কাযা করতে হয়

১. সাওম পালনকারী রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা সফরে থাকলে অথবা অন্য কোন ওযরের কারণে সাওম পালনে অপরগ হলে।

২. রাত মনে করে ভোরে পানাহার করলে। সম্প্রা হয়ে গেছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে।
 ৩. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভর্তি বমি করলে।
 ৪. জোরপূর্বক সাওম পালনকারীকে কেউ পানাহার করালে।
 ৫. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে চলে গেলে।
 ৬. ভুলক্রমে কোন কিছু খেতে শুরু করার পর সাওম নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে পুনরায় খেলে।
 ৭. দাঁত হতে ছোলা পরিমাণ কোন জিনিস বের করে খেলে।
- উল্লেখিত অবস্থায় সাওম নষ্ট হলেও সারাদিন না খেয়ে থাকতে হয় এবং পরে কাযা করতে হয়।

কাফফারা (الْكَفَّارَةُ)

ইচ্ছাকৃত সাওম পালন না করলে বা সাওম রেখে বিনা কারণে ভেঙে ফেললে কাযা এবং কাফফারা উভয়ই ফরয হবে।

সাওমের কাফফারা নিম্নরূপ

১. একাধারে দুই মাস সাওম পালন করা।
২. এতে অক্ষম হলে ৬০ জন মিস্কীনকে পরিতৃপ্তির সাথে দুই বেলা খাওয়ানো।
৩. একজন গোলামকে আযাদ করা।

একাধারে দুই মাস কাফফারার সাওম আদায়কালীন যদি মাসে দুই একদিন বাদ পড়ে যায় তবে পূর্বের সাওম বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় নতুন করে শুরু করে দুই মাস সাওম পালন করতে হবে। তবে মহিলাদের ব্যাপারে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে।

ইতিকাফ (الْإِعْتِكَافُ)

অর্থ

ইতিকাফ (إِعْتِكَافٌ) অর্থ অবস্থান করা, আটকে থাকা। শরীআতের পরিভাষায় সাংসারিক কাজকর্ম ও বিবি-বাচ্চা থেকে আলাদা হয়ে মসজিদে ইবাদাতের নিয়্যাতে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলা হয়।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইতিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া। এলাকাবাসীর মধ্য থেকে একজন আদায় করলেই আদায় হয়ে যাবে। আর কেউ আদায় না করলে সকলেই দায়ী হবে।

ইতিকাফকারী দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়। ফলে সে বেহুদা কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আল্লাহর সাথে মনের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। একাগ্রচিত্তে কয়েকদিন ইবাদাতের ফলে তার মনে আল্লাহর ভীতি গভীরভাবে রেখাপাত করে। ফলে দুনিয়ার চাকচিক্য তাকে আল্লাহর যিক্র হতে দূরে সরাতে পারে না। ইবাদাতে তার মনে শান্তি আসে।

ফযীলাত

ইতিকাফের ফযীলাত অনেক। নবী কারীম (স) নিয়মিতভাবে প্রতি বছর ইতিকাফ করতেন। হযরত আয়িশা (রা)

বলেন, “নবী কারীম (স) প্রতি রমযানের শেষ দশ দিন ই‘তিকাফ করতেন। এ আমল তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত বহাল ছিল। হুযূর (স) এর মৃত্যুর পর তাঁর বিবিগণও এ নিয়ম পালন করেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

নবী কারীম (স) বলেন, “ই‘তিকাফকারী গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে।” (ইব্ন মাজাহ)

রমযান মাসে লাইলাতুল কদর নামে একটি বরকতময় রাত আছে। যে রাত হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে, বিশেষভাবে ২৭ তারিখের রাতে লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ সময় ই‘তিকাফ অবস্থায় থাকলে ‘লাইলাতুল কদর’ লাভের সৌভাগ্য হতে পারে।

আদায়ের নিয়ম

রমযানের শেষ দশ দিনে ই‘তিকাফ করা সুন্নাত। এর সর্বনিম্ন সময় একদিন একরাত। রমযান মাস ছাড়াও মুস্তাহাব ই‘তিকাফ যে কোন সময় পালন করা যায়। জ্বীলোক নিজ ঘরে নির্দিষ্ট স্থানে ই‘তিকাফ করতে পারেন।

সাদাকাতুল ফিতর (صَدَقَةُ الْفِطْرِ)

ঈদের দিন সুবহি সাদিকের সময় যে ব্যক্তির হাতে জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ব্যতীত সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সমমূল্যের অন্য কোন সম্পদ থাকে তার ওপর ‘সাদাকাতুল ফিতর’ আদায় করা ওয়াজিব। এ পরিমাণ সম্পদকে শরীআতের পরিভাষায় নিসাব বলা হয়।

তাৎপর্য

যে বৎসর সাওম ফরয হয় সে বৎসরই হুজুর (স) মুসলমানের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেন। আমরা পবিত্র রমযান মাসে সাওম পালন করি। আল্লাহ তাআলার ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল হই। এসব দায়িত্ব পালনে অনেক সময় ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়। সাওম পালনে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় তার ক্ষতি পূরণের জন্য শরীআতে রমযানের শেষে সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। সাদাকাতুল ফিতর পেলে গরিব অনাথ লোকেরাও ঈদের খুশিতে শরীক হতে পারে। ধনী-গরিবের মধ্যে সৌহার্দ গড়ে ওঠে। ব্যবধান কমে আসে।

গুরুত্ব ও ফযীলাত

হাদীসে বর্ণিত আছে, “সাদাকাতুল ফিতর দ্বারা সাওম পালনে সকল দোষ-ত্রুটি দূরীভূত হয়, গরিবের পানাহারের ব্যবস্থা হয়।” (আবু দাউদ)। কেউ যদি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক নাও হয় অথচ আল্লাহর সম্ভৃতি অর্জনের জন্য ‘সাদাকাতুল ফিতর’ আদায় করে তবে সে অশেষ সাওয়াব পাবে।

আদায়ের নিয়ম

নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে। ঈদের দুই-একদিন আগে আদায় করা উত্তম। অন্যথায় ঈদের সালাতের আগে দেওয়া উচিত।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

মাথাপিছু নিস্ফে সা’ অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই কে.জি. গম বা তার মূল্য।

আমরা পবিত্র রামাদানে ই‘তেকাফ করব ও রামাদান শেষে গরিব মিস্কীনদের মাঝে সাদাকাতুল ফিতর বিতরণ করব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। জুম'আর সালাত—

ক. সুন্নাত	খ. ওয়াজিব
গ. ফরয	ঘ. মুস্তাহাব
- ২। ইতিক্রাফ অর্থ—

ক. বসবাস করা	খ. চলে যাওয়া
গ. অবস্থান করা	ঘ. সাওম পালন করা
- ৩। তাহাজ্জুদের সালাত—

ক. মুস্তাহাব	খ. সুন্নাত
গ. ওয়াজিব	ঘ. ফরয
- ৪। সাওম পালনের প্রধান উদ্দেশ্য—
 - i. তাকওয়া অর্জন
 - ii. সহনশীল হওয়া
 - iii. ক্ষমা পাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |
- ৫। পিতামাতাকে তাদের ছেলেমেয়েদের দশ বছর বয়সে সালাত আদায়ের জন্য শাসন করতে বলা হয়েছে ; যাতে তারা—
- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ক. সালাত ফরয হয়েছে বুঝতে পারে | খ. মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলে |
| গ. পিতা-মাতার আদেশ পালন করে | ঘ. সালাত ভালভাবে শিখতে পারে |

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ঢাকা থেকে খুলনা যাওয়ার পথে জনাব হাবুন-উর-রশীদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। অচেতন অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার দুই দিন পর জ্ঞান ফেরে।

- ৬। জনাব হাবুন-উর-রশীদকে উক্ত দুই দিনের সালাত—

ক. কাযা আদায় করতে হবে	খ. কাযা আদায় করতে হবে না
গ. অসুস্থ অবস্থায় ইশারায় পড়তে হবে	ঘ. অসুস্থতার জন্য আংশিক মাফ পাবে
- ৭। জনাব হাবুন-উর-রশীদ এর জ্ঞান ফেরার পর—
 - i. শুয়ে নামায পড়বেন
 - ii. বসে নামায পড়বেন
 - iii. চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নামায পড়বেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|-----------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। আনাসের মা আনাসকে সাওমের ফযীলাত ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে বলেন, সাওম নামাযের মতই ফরয। সাওমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, “তোমরা যেন সাওম থেকে তাকওয়া অর্জন করতে পার।” মহানবী (স) বলেছেন, “সাওম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ।” তোমার বাবার জন্য আমার আফসোস। তাঁর সাওম পালন সঠিকভাবে হয় না। তিনি আয়-রোজগার ও সংসারের খরচ করার সময় এবং মানুষের সাথে আচার আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে সুরণ রাখেন না। নিজের ইচ্ছেমত যা খুশি তাই করেন।
 - ক. সাওম অর্থ কী ?
 - খ. সাওমের একটি ফযীলাত বর্ণনা কর।
 - গ. আনাসের বাবা কিভাবে তাকওয়া অর্জনে ব্যর্থ হছেন এবং কেন ? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. “সাওম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ”— উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
- ২। মনসুর আহমেদ সাহেব একজন নামাযি মানুষ। তিনি আল্লাহর ইবাদাতে শান্তি পান। সারাদিন ব্যস্ততার মাঝেও যখনই সালাতের সময় হয়, তখনই তিনি জামাআতের সাথে সালাত আদায় করেন এবং অন্যান্য নফল সালাত আদায় করেন। তার বন্ধু নায়িম সাহেব তাঁকে জামাআতে সালাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন— জামাআতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় হয়।
 - ক. ইবাদাত অর্থ কি ?
 - খ. মনসুর আহমেদ সাহেব জামাআতের সাথে নিয়মিত সালাত আদায় করেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।
 - গ. মনসুর আহমেদ সাহেব ফরয সালাতের সাথে কোন্ কোন্ নফল সালাত আদায় করলে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সম্ভাবনা আছে। ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. জামাআতে সালাত আদায় করলে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় হয়, বুঝিয়ে লেখ।
- ৩। ইউসুফ সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি নিয়মিত সালাত ও সাওম পালন করেন। একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি পরিচিত। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাঁকে অনেক সময় দিতে হয় বিধায় তাঁর পক্ষে ই‘তিকাফে বসা সম্ভব হয় না বলে তিনি উল্লেখ করেন। তার স্ত্রী আসমা ই‘তিকাফের অনেক ফযীলাত এবং লাইলাতুল ক্বদরের ফযীলাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে বিধায় তিনি চান তার স্বামী প্রতি রমযানে ই‘তিকাফে বসেন। তিনি জানেন, ই‘তিকাফ সম্পর্কে মহানবী (স) বলেছেন, “ই‘তিকাফকারী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।”
 - ক. ই‘তিকাফ অর্থ কী ?
 - খ. ই‘তিকাফ বলতে কী বুঝ ? ব্যাখ্যা কর।
 - গ. ইউসুফ সাহেব কুরআন হাদীসের গুরুত্ব ও ফযীলাত অনুযায়ী কীভাবে প্রতি রমজানে ই‘তিকাফ পালন করতে পারেন ? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. “ই‘তিকাফকারী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে”— বুঝিয়ে লেখ।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ শিক্ষা

কুরআন মাজীদ (قُرْآنٌ مَّجِيدٌ)

পরিচিতি

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তাআলার বাণী। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। অন্যান্য আসমানী কিতাব কোন নির্দিষ্ট এলাকা ও বিশেষ মানব গোষ্ঠীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার কার্যকারিতা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে সমগ্র বিশ্বের সর্বকালের মানুষের জন্য। এটি মানুষকে শান্তির পথে পরিচালিত করে। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের নির্দেশ পালন করা সকলের ওপর ফরয। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

অর্থ : “এই কিতাব আমি নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। অতএব, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।” (আনআম ৬ : ১৫৫)

অবতরণ

কুরআন মাজীদ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এর ওপর অবতীর্ণ হয়। এটি প্রথমে “লাওহে মাহফুযে” সংরক্ষিত ছিল। সেখান থেকে রমযান মাসের লাইলাতুল কদরে প্রথম আসমানের “বায়তুল ইয্যাহ” নামক স্থানে এক সাথে নাযিল হয়।

হযরত মুহাম্মাদ (স) নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে সত্যের সন্ধানে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এমতাবস্থায় এক শুব মুহুর্তে হেরা গুহায় হযরত জিব্রাঈল (আ) আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর নিকট সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে আসেন। তিনি নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। মানব জাতির প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময়ে অবস্থা ও ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরআনের বিভিন্ন অংশ নাযিল হতে থাকে। এভাবে ২৩ বছরে সমগ্র কুরআনের অবতরণ সম্পন্ন হয়।

সংরক্ষণ

কুরআন মাজীদের যখন যে অংশ নাযিল হত মহানবী (স) সাথে সাথে তা নিজে মুখস্থ করে নিতেন। তিনি সাহাবীগণকেও তা মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। যে সকল সাহাবী লিখতে জানতেন তাঁরা সর্বদাই নবীজীর সঙ্গে থাকতেন। যখনই কুরআনের কোন অংশ নাযিল হত, তখনই তাঁরা তা লিখে রাখতেন। প্রধান ওহী লেখক ছিলেন হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা)। মহানবী (স) এর যুগে লেখার উপকরণ ছিল দুঃপ্রাপ্য। কাগজ সহজলভ্য ছিল না। তাই তখন কুরআন মাজীদের আয়াত লেখা হত ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ডে, পশুর চামড়ায়, হাড়ে ও খেজুরের ডালে।

কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝

অর্থ : “নিশ্চয় এ কুরআনের সংরক্ষণ এবং এর পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই।” (কিয়ামাহ ৭৫ : ১৭)

রাসূলুল্লাহ (স) এর নির্দেশে বহু সাহাবী কুরআন মাজীদ হিফয করে রাখেন। ফলে কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছিল ঠিক সেভাবেই তা সংরক্ষিত হয়। এর একটি আয়াত বা একটি অক্ষরেও কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন –

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

অর্থ : “আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।” (হিজর ১৪ : ৯)

সংকলন

মহানবী (স) এর ইনতিকালের পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) এর খিলাফত কালে ইয়ামামা নামক স্থানে ভদ্র নবী মুসাইলিমা কায্যাবের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে বহু সংখ্যক কুরআনের হাফিয শহীদ হন। তখন হযরত উমার (রা) এর পরামর্শে খলীফা হযরত আবু বকর (রা) প্রধান ওহী লেখক হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা) কে কুরআন মাজিদ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি বিভিন্ন সাহাবীদের কাছে কুরআনের যেসব অংশ লিখিত ছিল সেগুলো সংগ্রহ করেন এবং এর সাথে কুরআনের হাফিযগণ থেকেও সাহায্য নেন। এভাবে তিনি কুরআনের নির্ভুল প্রামাণ্য পাড়ুলিপি তৈরি করেন। এই পাড়ুলিপিটি খলীফা হযরত আবু বকর (রা) এবং পরে হযরত উমার (রা) এর নিকট সংরক্ষিত থাকে। তাঁর শাহাদাতের পর তা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা) এর কাছে গচ্ছিত রাখা হয়। ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) এর সময়ে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষায় কুরআনের পঠন নিয়ে মারাত্মক বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দেয়। এর ফলে মুসলিম ঐক্য বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। এ অবস্থায় হযরত উসমান (রা) বিশিষ্ট সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে যায়িদ ইবন সাবিত (রা) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি বিবি হাফসা (রা) এর নিকট সংরক্ষিত হযরত আবু বকর (রা) এর যুগে সংকলিত পাড়ুলিপিকে মূল হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা এর আরও সাতটি প্রতিলিপি তৈরি করেন। এরপর এক এক কপি বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কুরআন সংরক্ষণে হযরত উসমান (রা) এর অবদানের ফলে তাঁকে জামিউল-কুরআন বলা হয়।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. কুরআন মাজীদের পরিচয়।
২. কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

তাজ্বীদ (تَجْوِيدٌ)

তাজ্বীদ অর্থ বিন্যাস করা, সাজানো ও সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় কুরআন মাজীদের প্রতিটি হরফের মাখরাজ ও সিফাত জানা এবং মাদ্দ ও গুনাহু আদায় করার নিয়ম অবগত হওয়াকে তাজ্বীদ বলে। মাখরাজ অর্থ উচ্চারণ স্থল। আর সিফাত অর্থ হরফ উচ্চারণের বিশেষ রীতি।

কুরআন মাজীদ শুম্ভভাবে পাঠ করার জন্য তাজ্বীদ জানা আবশ্যিক। তাজ্বীদের সাথে কুরআন পাঠ করা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেন—

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝

অর্থ : “কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।” (মুয্যাম্মিল ৭৩ : ৪)

কুরআন পাঠের ফযীলাত অপরিসীম। কুরআন মাজীদ পাঠ করলে প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে কমপক্ষে দশটি নেকী পাওয়া যায়। কুরআন তিলাওয়াত নফল ইবাদাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহানবী (স) বলেন, “কুরআন তিলাওয়াত শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। কেননা কিয়ামতের দিন তা স্বীয় পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে।” (মুসলিম)

কুরআন মাজীদ যার জন্যে সুপারিশ করবে সে অবশ্যই জান্নাত লাভ করবে।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. তাজবীদের অর্থ ও উহার প্রয়োজনীয়তা।

২. শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠের ফযীলাত।

আমরা প্রত্যহ কুরআন মাজীদ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করব। অর্থ বুঝতে চেষ্টা করব।

মাদ্দ (مَدٍّ)

মাদ্দ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দীর্ঘ বা লম্বা করা। পরিভাষায় মাদ্দের হরফের ডানদিকের হরফতযুক্ত হরফ দীর্ঘ করে পড়াকে মাদ্দ বলে। যের, যবর এবং পেশকে হরফত বলা হয়।

মাদ্দের হরফ তিনটি (ا - و - ی)

নিম্নের শর্তগুলো পাওয়া গেলে মাদ্দের হরফকে দীর্ঘ করে পাঠ করতে হবে—

১. আলিফ এর ডান পাশের অক্ষরে যবর ۚ হলে যথা - بَا

২. ওয়া এর ওপর জয্ম ۛ এবং তার ডান পাশের অক্ষরে পেশ ۞ থাকলে যথা- بُو

৩. ইয়া এর ওপর জয্ম ۛ এবং ডান পাশের অক্ষরে যের ۟ থাকলে যথা- بِي

প্রকার

মাদ্দ দুই প্রকার

১. মাদ্দে আসলী (মূল মাদ্দ)।

২. মাদ্দে ফার্সি (শাখা মাদ্দ)।

মাদ্দের হরফের ডানে বা পরে জয্ম ۛ যুক্ত হরফ বা হাম্‌যা বা তাশ্দীদ না থাকলে তাকে মাদ্দে আসলী বলে। এর অপর নাম মাদ্দে তাবাস্‌ই। যথা - نُوحِيهَا

এ উদাহরণটিতে نُوحِي মাদ্দে আসলী। এখানে و এর ওপর জয্ম এবং তার পূর্বাঙ্কর ن এর ওপর পেশ রয়েছে।

حِي মাদ্দে আসলী। এখানে ی এর জয্ম এবং তার পূর্বাঙ্কর ح এর নিচে যের আছে।

هَا মাদ্দে আসলী। এখানে ا এর পূর্বাঙ্কর ه এর ওপর যবর আছে।

‘মাদ্দে আসলী’কে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। একটি সোজা আঙ্গুলকে স্বাভাবিকভাবে বাঁকা করে হাতের তালুতে লাগাতে যে সময়ের প্রয়োজন তাকে এক আলিফ পরিমাণ সময় বলে।

কুরআন মাজীদের যে সকল হরফের ওপর খাড়া যবর ۚ নিচে খাড়া যের ۟ এবং ওপরে উল্টো পেশ ۞ আছে, সে সকল হরফকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যথা- بِهٖ-وَمَا لَهُ-مَلِكْ

কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে হরফের ওপর মাদ্দের আলামত স্বরূপ ۞ চিহ্ন আছে, আবার কোথাও বা ۞

এরূপ দীর্ঘ মাত্রার চিহ্ন আছে। এ সকল হরফকে দীর্ঘ করে পড়তে হবে। প্রথম প্রকারের মাদ্দকে তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতে হয়। যেমন- مَّا أَغْنَىٰ-مَّا أَنْزَلَ

যেমন- جَاءَ-ق-وَرَاءَ-أُولَئِكَ

ওয়াক্ফ (وَقْفٌ)

ওয়াক্ফ অর্থ থামা, বিরতি দেওয়া। তাজবীদের পরিভাষায় দুই নিঃশ্বাসের মধ্যবর্তী বিরতির সময়কে ওয়াক্ফ বলে। ওয়াক্ফ করার সময় শব্দের হরকতযুক্ত শেষ হরফকে জয্ম দিতে হবে। শব্দের শেষ হরফকে জয্ম না দিয়ে হরকতের ওপর ওয়াক্ফ করা নিষেধ। আয়াত পাঠের সময় বিরাম চিহ্নের পূর্বেই ওয়াক্ফের প্রয়োজন হলে থামা যাবে, তবে যে শব্দে ওয়াক্ফ করা হবে ঐ শব্দ থেকেই পুনরায় তিলাওয়াত শুরু করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের সময় প্রত্যেক আয়াতে ওয়াক্ফ করতেন। নিম্নে কুরআন মাজীদে বিরাম চিহ্নসমূহের বর্ণনা প্রদান করা হল—

- - বাক্যের শেষে এ চিহ্ন থাকলে তাতে আয়াতের শেষ বুঝায়। এ চিহ্নকে ‘ওয়াক্ফ তাম’ বলা হয়। এখানে থামতে হবে।
- م - এটাকে ‘ওয়াক্ফ লায়িম’ বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দেওয়া অত্যাবশ্যিক।
- ط - এটাকে ‘ওয়াক্ফ মুত্লাক’ বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি উত্তম।
- ج - এটাকে ‘ওয়াক্ফ জাইয’ বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা না থামা উভয়ের অনুমতি আছে। থামাই ভাল।
- ز - এটাকে ‘ওয়াক্ফ মুজাওয়ায’ বলে। এখানে না থামাই ভাল।
- ص - এটাকে ‘ওয়াক্ফ মুরাখ্বাস’ বলে। এরকম চিহ্নিত স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়া ভাল।
- ق - এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামার ব্যাপারে মতভেদ আছে। না থামা ভাল।
- قف - এটা থামার নির্দেশ। এখানে থামা উত্তম।
- لا - এটা না থামার নির্দেশ। এখানে থামা যাবে না।
- صل - এখানে থামা ও না থামা দুই-ই চলে। তবে থামাই উত্তম।
- صلى - এখানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।
- س / سَكَّتْهُ - এটাকে সাক্তা বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে পড়া ক্ষান্ত দিয়ে কিঞ্চিৎ থামতে হবে, কিন্তু শ্বাস ছাড়া যাবে না।
- ت / مع / مُعَانَقَةٌ - এর নাম ‘ওয়াক্ফ মুআনাকা’। আয়াতের বা শব্দের ডান এবং বামে যদি উক্ত তিন বিন্দু অথবা مع চিহ্ন থাকে তবে যে কোন এক স্থানে থামলে অপর স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়।
- وَقْفُ النَّبِيِّ ص - ওয়াক্ফুন নাবিয়্যি এখানে নবী কারীম (স) থেমে ছিলেন।
- وَقْفُ جِبْرَائِيلَ ع - ওয়াক্ফু জিব্রাঈল- এরূপ স্থানে থামলে বরকত লাভ হয়।
- وَقْفُ عُفْرَانَ - ওয়াক্ফু গুফরান- এরূপ স্থানে থামলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।

নাযিরা তিলাওয়াত

আল্লাহ তাআলা আমাদের অসংখ্য নিআমত দান করেছেন। তাঁর এ অগণিত নিআমতের মধ্যে পবিত্র কুরআন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিআমত। কুরআন তিলাওয়াতের বহু ফযীলাত আছে। যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবে এবং এর ওপর আমল করবে আল্লাহ তাআলা আখিরাতে তাকে বিরাট সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন। তার পিতা-মাতাকে আখিরাতে এমন একটি মুকুট পরাবেন যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও উত্তম হবে।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

১. ওয়ূ করে মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত করা।
২. তিলাওয়াতের সময় কথা-বার্তা না বলা, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি না করা।
৩. ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করা।

এ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীরা সূরা বাকারার ৫ম রুকু থেকে ৮ম রুকু পর্যন্ত দেখে দেখে শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত শিখবে। শিক্ষক প্রথমে তিলাওয়াত করবেন। শিক্ষার্থীরা তা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এরপর শিক্ষার্থীরা তা তিলাওয়াত করবে। শিক্ষক শুনবেন। কোন ভুল হলে তা সংশোধন করে দেবেন। শিক্ষার্থীরা পুনরায় তা শিক্ষককে তিলাওয়াত করে শোনাবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিখবে। নিয়মিত তিলাওয়াত করবে।

সূরা আদিয়াত (سُورَةُ الْعَدِيَّتِ)

(মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা ১১)

সূরার প্রথম শব্দ আল-আদিয়াত। এ শব্দ অনুসারে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আমরা সূরাটি মুখস্থ করব। এর অর্থ জানব।

শব্দার্থ

أَلْعَدِيَّتِ – ধাবমান অশুরাজি। ضَبْحًا – উর্ধ্বশ্বাসে। أَلْمُؤَرِّيَّتِ – অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণকারী অশ্বসমূহ।
 قَذْحًا – ক্ষুরাঘাতে। أَلْمُغِيرَاتِ – অভিযানকারী, হামলাকারী। صُبْحًا – প্রভাতকালে।
 أَثَرْنَ – উৎক্ষিপ্ত করে। نَقَعًا – ধূলি। كُنُودٌ – অকৃতজ্ঞ। أَلْخَيْرِ – সম্পদ।
 بُعِثَرُ – উত্থিত হবে। خَبِيرٌ – অবহিত।

অনুবাদ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশুরাজির,
২. যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে,
৩. যারা অভিযান করে প্রভাতকালে,
৪. ও সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে,
৫. এরপর শত্রুদলের ভিতর ঢুকে পড়ে,
৬. মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ,
৭. এবং সে অবশ্যই এ বিষয়ে অবহিত,
৮. এবং অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে প্রবল,
৯. তবে সে কি সে সম্পর্কে অবহিত নয় যখন
কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে,
১০. এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে ?
১১. সেদিন তাদের কি ঘটবে, সে সম্পর্কে তাদের
পালনকর্তা সর্বিশেষ অবহিত।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 وَالْعَدِيَّتِ ضَبْحًا ۝
 فَأَلْمُؤَرِّيَّتِ قَذْحًا ۝
 فَأَلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝
 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۝
 فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝
 وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝
 وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝
 أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَرَ مَافِي الْقُبُورِ ۝
 وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝
 إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

আরবের সমাজ ছিল বর্বর। লুটতরাজ এবং খুন-খারাবি ছিল তাদের প্রতিদিনের কাজ। সম্পদের মোহে তারা আখিরাতকে ভুলে থাকত। এ সূরায় আল্লাহ তাআলা আখিরাতকে ভুলে থাকা সকল মানুষকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তাদের অন্তরের সব কুচিন্তা ভাবনা তাদের সামনে উপস্থিত করবেন। আর সে অনুসারেই তিনি তাদের বিচার করবেন।

এ সূরা থেকে আমরা শিখতে পাই

১. সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ তাআলার প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।
 ২. মানুষ স্বভাবগতভাবে অধিক সম্পদলোভী।
 ৩. আরও অধিক সম্পদের লোভ মানুষকে বিপথগামী করে।
 ৪. আখিরাতে সকল মানুষকে জীবিত করা হবে।
 ৫. সেখানে তারা নিজেদের সকল কার্যকলাপ দেখবে, অন্তরের কুচিন্তা ভাবনাও উপস্থিত দেখতে পাবে। আর সে অনুসারেই তাদের বিচার হবে।
 ৬. দুনিয়া ও সম্পদের মোহে পড়ে আল্লাহকে ভুলে থাকা বড় অপরাধ।
- আমরা সকল কুচিন্তা-অপকর্ম পরিহার করব। আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে জীবনযাপন করব।

সূরা কারিআহ্ (سُورَةُ الْقَارِعَةِ)

(মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা ১১)

সূরার প্রথম শব্দ ‘আল-কারিআহ্’ কে সূরার নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কারিআহ্ অর্থ সজোরে আঘাতকারী, এখানে এর অর্থ কিয়ামত বা মহাপ্রলয়। এ সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য এবং তার পরবর্তী হিসাব-নিকাশের বর্ণনা রয়েছে। এ দিক দিয়ে সূরার মূল বক্তব্যের সাথে নামের গভীর মিল আছে।

আমরা সূরাটি মুখস্থ করব এবং এর অর্থ জানব।

শব্দার্থ

جِبَالٌ - পর্বতসমূহ। مَبْنُوتٌ - বিক্ষিপ্ত। فَرَاشٌ - পতঙ্গ। الْقَارِعَةُ - সজোরে আঘাতকারী, মহাপ্রলয়।
 أُمٌّ - স্থান। مَوَازِينُ - পাল্লাসমূহ। ثَقُلْتُ - ভারী। مَنفُوشٌ - ধূনি। عِهْنٌ - রজ্জীন পশম।
 هَاوِيَةٌ - গভীর গর্ত, একটি জাহান্নামের নাম। حَامِيَةٌ - জ্বলন্ত, উত্তপ্ত।

অনুবাদ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

১. মহাপ্রলয়,

الْقَارِعَةُ ۝

২. মহাপ্রলয় কী ?

مَا الْقَارِعَةُ ۝

৩. মহাপ্রলয় সম্পর্কে আপনি কী জানেন ? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ط
৪. যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঞ্জোর মত, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ٧
৫. এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ط
৬. তখন যার পাল্লা ভারী হবে, فَأَمَّا مَنْ تَفَلَّتْ مَوَازِينُهُ ٧
৭. সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ ط
৮. কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ٧
৯. তার স্থান হবে হাবিয়া। فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ط
১০. তা কী, আপনি কি তা জানেন ? وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّةُ ط
১১. তা অতি উত্তপ্ত আগুন। نَارٌ حَامِيَةٌ ٥

সূরা কারিআহ্ এর প্রথম তিনটি আয়াতে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা বর্ণনার উদ্দেশ্যে তিন বার কারিআহ্ বা মহাপ্রলয় শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরের দুইটি আয়াতে বলা হয়েছে, এ দিন মানুষ চতুর্দিকে এমনভাবে দৌড়াতে থাকবে যেমন আলোর চারিধারে কীট-পতঙ্গা বিক্ষিপ্তভাবে উড়তে থাকে। আর ভারী ভারী পাহাড়-পর্বত নিজেদের স্থান থেকে উপড়ে যাবে এবং ধুনিত পশমের মতো উড়তে থাকবে। পরবর্তী ছয়টি আয়াতে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিনে যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে সে জান্নাতে সুখের জীবন লাভ করবে। আর যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে সে গভীর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

এ সূরা পাঠে আমাদের শিক্ষা দেয়

১. এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী।
২. একদিন এ পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন হবে কিয়ামত।
৩. কিয়ামতের পর হাশরের ময়দানে মানুষের ভালমন্দ আমল ওজন করা হবে।
৪. যার নেক আমল বেশি হবে সে সুখের জীবন লাভ করবে। আর যার বদ আমল বেশি হবে সে অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

আমরা আল্লাহর আদেশ মেনে চলব, নেক আমল করব এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকব। আমরা ইহ ও পরকালে আল্লাহর রহমত পাব, সুখি হব।

সূরা তাকাসূর (سُورَةُ التَّكْوِيْنِ)

(মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা ৮)

সূরাটির প্রথম আয়াতে উল্লেখিত আত তাকাসূর শব্দ অনুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা তাকাসূর। তাকাসূর অর্থ প্রাচুর্য। অধিক ধন-সম্পদের মোহে মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকে। আখিরাতের কথা চিন্তা করে না। আর এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু এসে যায়। সূরার আলোচ্য বিষয়ের সাথে নামের বিশেষ মিল আছে। আমরা সূরাটি মুখস্থ করব। অর্থ জানব।

শব্দার্থ

أَلْهَاكُمْ - তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করেছে, গাফিল করেছে। التَّكَاثُرُ - প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা।

حَتَّى - যতক্ষণ না। رُزْتُمْ - তোমরা উপনীত হয়েছ। الْمَقَابِرُ - কবরসমূহ। سَوْفَ - শীঘ্রই।

تَعْلَمُونَ - তোমরা জানবে। جَحِيمٌ - জাহান্নাম। نَعِيمٌ - নিআমত।

অনুবাদ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ০

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন রাখে

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।

حَتَّى رُزْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

৩. এটা সজ্ঞাত নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে,

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

৪. আবার বলি এটা সজ্ঞাত নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

৫. সাবধান ! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে
অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝

৬. তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই,

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝

৭. আবার বলি, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুস প্রত্যয়ে,

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝

৮. এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের নিআমত
সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ০

মানুষ অধিক ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য এবং মান-মর্যাদা লাভের মোহে আখিরাতের কথা ভুলে যায়। তারা দুনিয়ার প্রাচুর্য লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। আর এমতাবস্থায় তাদের মৃত্যু এসে যায়। তারা যদি জানত এবং বুঝত, আখিরাত দুনিয়ার তুলনায় অনেক উত্তম, তাহলে দুনিয়ার প্রতি তাদের এমন লোভ লালসা হত না। আর এ কথাটি যে অতি সত্য তা খুব শীঘ্রই তারা বুঝতে পারবে। মৃত্যুর পর আখিরাতে তারা জাহান্নাম নিজ চোখে দেখতে পাবে। দুনিয়াতে তাদের যেসব নিআমত দেওয়া হয়েছে সেখানে সে সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এ সূরা থেকে আমরা শিখতে পাই

১. সম্পদের চিন্তায় বিভোর হয়ে আখিরাতকে ভুলে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

২. যে সকল লোক অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করে, তারা পরকালে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

৩. দুনিয়ার নিআমত সম্পর্কে মানুষকে পরকালে হিসাব দিতে হবে।

আমরা ধন-দৌলতের লোভে পড়ে আখিরাতকে ভুলে থাকব না। গরিব-দুঃখী এবং অনাথদের সাহায্য সহযোগিতা করব। আল্লাহর দেওয়া নিআমত আল্লাহর পথে অকাতরে খরচ করব।

সূরা লাহাব (سُورَةُ اللَّهَبِ)

(মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৫)

শব্দার্থ

تَبَّتْ - ধ্বংস হোক। يَدَا - দুই হাত। تَبَّ - ধ্বংস হয়েছে। مَا أَغْنَى - কোন কাজে আসেনি, রক্ষা করেনি। كَسَبَ - সে উপার্জন করেছে। سَيَصْلَى - শিগ্গিরই প্রবেশ করবে, জ্বলবে। ذَاتَ لَهَبٍ - লেলিহান, শিখায়ুক্ত। إِمْرَأَتُهُ - তার স্ত্রী। حَمَّالَةَ الْحَطَبِ - ইন্ধন বহনকারিণী, নিন্দাকারিণী। فِي جِيدِهَا - তার গলায়। حَبْلٌ - রশি। مَسَدٌ - পাকানো।

শানে নুযূল

একদিন রাসূলুল্লাহ (স) পাহাড়ে দাঁড়িয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন। সাথে সাথে সবার আগে আবু লাহাব বলে ওঠে – تَبَّالَكَ তুমি ধ্বংস হও। তার এ হঠকারী উক্তির প্রেক্ষিতে সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

নামকরণ

প্রথম আয়াতে উল্লেখিত ‘লাহাব’ শব্দ দিয়েই সূরাটি নামকরণ করা হয়েছে। সূরাটিকে ‘লাহাব’ বা ‘মাসাদ’ নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

অনুবাদ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১। ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং
ধ্বংস হোক সে নিজেও।

২। কোন কাজে আসেনি তার ধন সম্পদ ও
যা সে উপার্জন করেছে।

৩। শিগ্গিরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে।

৪। এবং তার স্ত্রীও - যে ইন্ধন বহন করে,

৫। তার গলায় পাকানো রশি।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ط

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ط

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ

وَإِمْرَأَتُهُ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۚ

মর্মার্থ

এ সূরায় রাসূলুল্লাহ (স) এর শত্রুতায় ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিলার জঘন্য ভূমিকার বর্ণনা রয়েছে। আবু লাহাব হযরতের আপন চাচা হয়েও তাঁর বিরুদ্ধাচরণে ক্ষেত্রে সব সময় অগ্রগামী ছিল। তার স্ত্রীও আল্লাহর রাসূল (স) এর পথে কাঁটা বিছিয়ে ও নিন্দাবাদ করে স্বামীর দুষ্কর্মে সাহায্য করত। কিন্তু তাদের এ শত্রুতা ইসলামের অগ্রগতিককে বাধা দিতে ব্যর্থ হবে এবং তাদের এ কাজের প্রতিফল হিসেবে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে এ সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে।

এ সূরা থেকে আমরা শিখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি শত্রুতা ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ জঘন্যতম অপরাধ। আমরা আরও জানতে পারি যে, ঈমান ও নেক আমল ছাড়া শুধুমাত্র আত্মীয়তার বন্ধন কাউকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে না।

আমরা আল্লাহর রাসূল (স) এর প্রতি মুহাব্বাত রাখব এবং বিরুদ্ধাচরণ করব না।

সূরা ইখলাস (سُورَةُ الْإِخْلَاصِ)

(মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৪)

ইখলাস অর্থ একনিষ্ঠতা। এ সূরায় একনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল তাওহীদের বর্ণনা আছে। এ কারণে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে ‘ইখলাস’। মক্কায় কাফির মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট আল্লাহ তাআলার বংশ পরিচয় জানতে চায়। তারা আবার তাঁর নিকট জানতে চায়, আল্লাহ তাআলা কিসের তৈরী-স্বর্ণের, রৌপ্যের না অন্য কিছুর? তখন আল্লাহ তাআলা তাদের এসব প্রশ্নের জবাবে সূরা ইখলাস নাযিল করেন।

আমরা এ সূরাটি মুখস্থ করব, অর্থ জানব এবং সব সময় তিলাওয়াত করব।

শব্দার্থ

لَمْ يُولَدْ - তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। لَمْ يَلِدْ - তিনি কাউকে জন্ম দেননি। الصَّمَدُ - মুখাপেক্ষী নন। أَحَدٌ - একক। كُفُؤًا - সমতুল্য।

অনুবাদ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ০

১. বলুন, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ১

২. আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন,

اللَّهُ الصَّمَدُ ২

৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি কারও জাত নন।

لَمْ يَلِدْ ۖ لَمْ يُولَدْ ۖ

৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ৪

এ সূরায় আল্লাহ তাআলার পরিচয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে অংশীবাদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে আল্লাহ তাআলার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

এ সূরায় আমরা জানতে পারলাম

১. আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় এবং অমুখাপেক্ষী।

২. আমরা সবাই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী।

৩. তাঁর সমতুল্য কেউই নয়।

আমাদের তাঁরই আদেশ নিষেধ মেনে চলতে হবে। একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে হবে। অন্য কারও ইবাদাত করা যাবে না।

মুনাজাতমূলক আয়াত

আমরা অনেক সময় অজ্ঞতাবশত এবং শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পাপ কাজ করে বসি। এ জন্য আমাদের অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। তাঁর নিকট ক্ষমা চেয়ে মুনাজাত করলে তিনি আমাদের মাফ করে দেবেন বলে আশা করা যায়। আল্লাহ পাকের নিকট মুনাজাত করলে তিনি খুশি হন। আল্লাহ তাআলার কাছে কীভাবে

মুনাজাত করতে হবে তা তিনি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। আমরা এ শ্রেণীতে মুনাজাতমূলক তিনটি আয়াত মুখস্থ করব, অর্থ শিখব এবং এগুলো ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলার কাছে মুনাজাত করব।

১. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

অর্থ : “হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।” (আ’রাফ ৭ : ২৩)

হযরত আদম (আ) বিবি হাওয়া (আ) প্রথমে জান্নাতে বসবাস করতেন। আল্লাহ তাআলা সেখানে তাঁদের সকল প্রকার ফলমূল ও খাদ্য খাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেন। তাঁরা শয়তানের প্ররোচনায় ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। তখন আল্লাহ বেহেশত থেকে তাঁদের বের করে দুনিয়াতে পাঠান। তাঁরা দুনিয়াতে এসে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কান্নাকাটি করেন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের এ মুনাজাতটি শিখিয়ে দেন। তাঁরা বিনীতভাবে এ দুআ পাঠ করে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চান। আল্লাহ পাক তাঁদের দুআ কবুল করেন।

আমরাও আমাদের অপরাধ স্বীকার করব। আল্লাহ তাআলার নিকট বিনীতভাবে মুনাজাত করব।

২. رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

অর্থ : “হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি নিজ থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।” (কাহ্ফ ১৮ : ১০)

মহানবী (স) এর আবির্ভাবের কয়েকশ বছর আগে দাকইয়ানুস নামক এক অত্যাচারী বাদশা মুসলমানগণের ওপর অত্যাচার শুরু করে। এ সময় কয়েকজন যুবক বাদশাহর অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এবং নিরাপদে আল্লাহর ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন সাত জন এবং এঁদেরকেই বলা হয় আসহাবে কাহ্ফ বা গুহাবাসী। গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁরা আল্লাহ তাআলার নিকট মুনাজাত করেন। আল্লাহর রহমত কামনা করেন। যেন তাঁরা গুহায় নিরাপদ থেকে সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের দুআ কবুল করেন।

যুগে যুগে সত্যাশ্রয়ী যুবকগণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। আমরাও অন্যায়কে মেনে নেব না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াব। আমাদের সকল বিপদ আপদে আল্লাহ তাআলার রহমত কামনা করে মুনাজাত করব। তিনি আমাদের প্রতি দয়া করবেন। আমাদের সকল কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবেন।

৩. رَبَّنَا أَمَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝

অর্থ : “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আপনি আমাদের ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।” (মু’মিনুন ২৩ : ১০৯)

আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, দয়ালু। তাঁর দয়া অসীম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা দয়াকে একশত ভাগে ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ নিজের জন্যে রেখেছেন। আর একটি মাত্র ভাগ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বণ্টন করেছেন।” (বুখারী)। এ থেকে বুঝা যায় আল্লাহর দয়া ও কবুল কত বেশি। বান্দা নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন। দয়া প্রদর্শন করেন। আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখব। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা চাইব। তাঁর দয়া কামনা করব। তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন। আমরা তাঁর দয়া লাভ করব।

হাদীস শরীফ (اَلْحَدِيثُ)

পরিচয়

হাদীস মানে কথা বা বাণী। ইসলামের পরিভাষায় মহানবী (স) এর বাণী, কর্ম ও অনুমোদনকে হাদীস বলা হয়।

গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। এটি কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা। কুরআন মাজীদে অনেক কিছু সংক্ষেপে বলা হয়েছে। হাদীসে তাঁর বিস্তারিত বিবরণ আছে। রাসূলুল্লাহ (স) এর জীবন আদর্শ আমরা হাদীসে পাই। এ কারণে আমাদের জীবনে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা বলেন – “আর রাসূল তোমাদের যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।” (হাশর ৫৯ : ৭)

সিহাহ্ সিভাহ্ (اَلصِّحَاحُ السِّتَةُ)

প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ ছয়টি। এগুলোকে এক সাথে সিহাহ্ সিভাহ্ বলে। ‘সিহাহ্’ অর্থ বিশুদ্ধ এবং সিভাহ্ অর্থ ছয়। এ ছয়টি গ্রন্থে মহানবী (স) এর সহীহ্ হাদীসসমূহ একত্রিত করা হয়েছে বলে এগুলোকে সিহাহ্ সিভাহ্ বলে। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল—

১. সহীহ্ বুখারী : হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সহীহ্ বুখারী। কুরআন মাজীদের পর এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এর সংকলকের নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র)। তিনি ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে এটি সংকলন করেন। এটি ৩০ পারায় বিভক্ত।
২. সহীহ্ মুসলিম : এর সংকলকের নাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র)। তিনি তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে এটি সংকলন করেন। বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সহীহ্ বুখারীর পরে এর স্থান।
৩. সুনানে নাসাঈ : এর সংকলকের নাম আহমাদ ইব্ন শুআইব নাসাঈ। বুখারী ও মুসলিম শরীফের পরই নাসাঈ শরীফের স্থান।
৪. সুনানে আবু দাউদ : এর সংকলকের নাম আবু দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশুআছ। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে এটি সংকলন করেন। এর বিন্যাস পদ্ধতি উন্নতমানের।
৫. জামি’ তিরমিযী : এর সংকলকের নাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা তিরমিযী। তিনি তাঁর এ কিতাব সম্পর্কে বলেন, “যার ঘরে এ কিতাবখানা থাকবে, মনে করা যাবে যে, তার ঘরে নবী কারীম (স) আছেন এবং তিনি নিজে কথা বলছেন।”
৬. সুনানে ইব্ন মাজাহ্ : এর সংকলকের নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্। হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

মুনাজাতমূলক হাদীস

আমরা আল্লাহ পাকের কাছে কী চাইব, কিতাবে চাইব মহানবী (স) আমাদের তা শিখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শেখানো নিম্নের তিনটি হাদীস আমরা মুখস্থ করব, অর্থ জানব এবং মুনাজাতে ব্যবহার করব।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَ سَهِّلْنِيْ - ①

অর্থ : “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সৎপথ দেখান এবং আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।” (মুসলিম)

আল্লাহ তাআলার দেখানো পথই সরল সহজ ও সঠিক। আমরা তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করব ও সে পথে চলব।

② — اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى —

অর্থ : “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই পথের দিশা, চাই সৎকাজ করার এবং অসৎকর্ম পরিহার করার শক্তি। চাই পবিত্রতা যাতে পরের অর্থ সম্পদের লোভ লালসা থেকে বাঁচতে পারি। আরও চাই অভাব অনটন থেকে মুক্তি।” (মুসলিম ও তিরমিযী)।

③ — اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي —

অর্থ : “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি দয়া করুন। আমাকে নিরাপদে রাখুন। আমাকে রিযিক দান করুন।” (মুসলিম)

নীতিমূলক হাদীস

আমাদের চরিত্র ও নৈতিক মান উন্নত করার জন্য মহানবী (স) আমাদের অনেক উপদেশ দান করেছেন। তাঁর উপদেশ মেনে চললে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারব। আমরা নিম্নের নীতিমূলক হাদীস তিনটি মুখস্থ করব এবং অর্থ শিখব-

① — لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ —

অর্থ : “যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই (তার ঈমান অপূর্ণ)।” (আহমাদ)

ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সাথে অবিশ্বাসের কাজ করতে ও আমানতের খিয়ানত করতে পারে না। খিয়ানত ঈমান বিরোধী ও সমাজদ্রোহী কাজ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র জনগণের সম্পত্তি। এগুলো ছাত্র-শিক্ষকের নিকট আমানত। দেশের সম্পদ জনগণের নিকট আমানত। এ আমানতের খিয়ানত বড় অপরাধ। আমরা আমানত রক্ষা করব।

② — لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَجِمَ —

অর্থ : “রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (বুখারী ও মুসলিম)

পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা, ফুফু, মামা, খালা, দাদা-দাদীর সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক আছে। তাঁদের সাথে সদ্ভাবহার করা, প্রয়োজনে তাঁদের আর্থিক সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। এতে তাঁরা খুশি হবেন। আল্লাহর কাছেও পুরস্কার পাওয়া যাবে। আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখব।

③ — الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ —

অর্থ : “সালাত দীন ইসলামের স্তম্ভ।” (বায়হাকী)

স্তম্ভ ছাড়া যেমন ঘরের কল্পনা করা যায় না, তেমনি সালাত ছাড়া দীন ইসলামের কল্পনা করা যায় না।

সালাত বেহেশতের চাবি। সালাত মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী। সালাতে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। আমরা সালাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করব। নিষ্ঠার সাথে সালাত আদায় করব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে—

ক. মুসলমানদের জন্য

খ. মক্কাবাসীর জন্য

গ. সমগ্র মানব জাতির জন্য

ঘ. আরব জাতির জন্য

২। কুরআন মাজীদ প্রথমে সংরক্ষিত ছিল—

ক. হাফিজগণের অন্তরে

খ. হযরত আবু বকর (রা) এর কাছে

গ. লাওহে মাহফুযে

ঘ. হযরত ওসমান (রা) এর কাছে

৩। সূরা আদিয়াত অবতীর্ণ হয়—

ক. মদীনায়

খ. জেদ্দায়

গ. মক্কায়

ঘ. তায়িফে

৪। মাদ্দে আসলীকে কতটুকু দীর্ঘ করে পড়তে হয় ?

ক. এক আলিফ

খ. দুই আলিফ

গ. তিন আলিফ

ঘ. চার আলিফ

৫। হাদীস অর্থ—

ক. উপদেশ

খ. বাণী

গ. গ্রন্থ

ঘ. পাঠ

৬। সালাত দীন ইসলামের সত্য বলতে বুঝানো হয়েছে—

ক. সালাতের উপর ইসলাম দণ্ডায়মান

খ. সালাত ও ইসলাম সমার্থক

গ. সালাত ইসলামের মৌলিক ইবাদাত

ঘ. সালাত নিষ্ঠার সাথে আদায় করতে হয়

৭। হযরত ওসমান (রা) কে জামিউল-কুরআন বলা হয়, কারণ—

ক. তিনি হাদীস সংরক্ষণে অবদান রেখেছেন

খ. তিনি কুরআনের তাফসীর রচনা করেছেন

গ. তিনি কুরআন সংরক্ষণে অবদান রেখেছেন

ঘ. তিনি আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৮ ও ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

“হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।”

৮। কুরআনের এ আয়াতটিতে—

i. পার্থিব কল্যাণ চাওয়া হয়েছে

ii. স্বীয় অপরাধ স্বীকার করা হয়েছে

iii. পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি চাওয়া হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

৯। কুরআনের এ আয়াতটি একজন মু'মিনকে শিক্ষা দেয়—

ক. ক্ষমাপ্রার্থী হতে

খ. মর্যাদাবান হতে

গ. দয়াবান হতে

ঘ. পরোপকারী হতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আজমল হোসেন কুরআন হাদীস সম্পর্কে ভাল জানেন। তিনি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। চাকুরি পাওয়ার পর বিয়ে করে পরিবার নিয়ে শহরে চলে যান। তারপর থেকে পিতা-মাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন না। এমনকি বিপদে আপদেও টাকা পাঠাচ্ছেন না। অথচ হাদীসে আছে “রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

ক. হাদীস কী ?

খ. রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী বলতে কী বোঝ ?

গ. হাদীস অনুযায়ী আজমলের পিতা-মাতার প্রতি কীরূপ ব্যবহার করা উচিত ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না”—হাদীসটি বুঝিয়ে লেখ।

- ২। সূরা কারিআহুতে আল্লাহ তাআলা বলেন, “মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কী ? মহাপ্রলয় সম্পর্কে আপনি কী জানেন ? যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঞ্জের মত এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙীন পশমের মত, তখন যার পাল্লা ভারী হবে, সেতো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়া।”
- ক. হাবিয়ার অর্থ কী ?
- খ. উল্লিখিত সূরাকে কারিআহু নাম দেওয়া হলো কেন ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা থেকে তুমি কী শিক্ষা লাভ করতে পার ?
- ঘ. কিয়ামতের দিবসে মানুষের ভালমন্দ আমল ওজন করা হবে, বিষয়টি বুঝিয়ে লিখ।
- ৩। আমরা জানি কুরআন শরীফ রমযান মাসের লাইলাতুল কদরে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “এই কিতাব আমি নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। অতএব তোমরা তার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।” আল্লাহ আরো বলেন, “কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।”
- ক. লাইলাতুল কদর এর অর্থ কী ?
- খ. দয়া প্রদর্শন করা হবে বলতে কী বুঝানো হয়েছে ?
- গ. কুরআনের আয়াত অনুযায়ী আমরা কীভাবে কল্যাণ পেতে পারি ?
- ঘ. কুরআন শুম্ভভাবে আবৃত্তি করতে না পারলে নামায সঠিকভাবে আদায় হয় না— বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক (أَخْلَاقُ)

পরিচয়

আখলাক (أَخْلَاقُ) খুলুকুন (خُلُقٌ) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। মানুষের কাজ-কর্মের মাধ্যমে তার আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং স্বভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাকেই আখলাক বলে। মানুষের চরিত্রের সব দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জীব-জন্তুর সাথে মানুষের আচার-ব্যবহারও আখলাকের অন্তর্ভুক্ত।

আখলাকের প্রকারভেদ

আখলাক দুই প্রকার

১. আখলাকে হামীদা (أَخْلَاقٌ حَمِيدَةٌ) : উত্তম চরিত্রকে আখলাকে হামীদা বা প্রশংসনীয় আখলাক বলা হয়। যেমন- ক্ষমা, আমানতদারী, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরোপকারিতা, শালীনতা, সৎকাজে সহযোগিতা ইত্যাদি।
২. আখলাকে যামীমা (أَخْلَاقٌ ذَمِيمَةٌ) : নিকৃষ্ট চরিত্রকে আখলাকে যামীমা বা নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন- মিথ্যা বলা, গালি দেওয়া, চুরি করা ইত্যাদি।

আখলাকে হামীদা (أَخْلَاقٌ حَمِيدَةٌ)

আখলাকে হামীদার গুরুত্ব

মানব জীবনে আখলাকে হামীদার গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় সুখ-শান্তি আখলাকে হামীদা বা প্রশংসনীয় চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। আখিরাতের সুখ-দুঃখও আখলাকে হামীদার ওপর নির্ভর করে।

আখলাকে হামীদার সুফল

১. আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভ

উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন—“তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আমার নিকট অধিক প্রিয় যার চরিত্র সর্বোত্তম।” (বুখারী ও মুসলীম)

২. ঈমানের পূর্ণতা অর্জন

উত্তম চরিত্র মানুষের ঈমানকে পূর্ণতা দান করে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন—

— أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا —

অর্থ : “পূর্ণ মুমিন তাঁরাই যাদের চরিত্র মহান ও সুন্দরতম।” (আবু দাউদ)

৩. সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট এবং সমাজে উঁচু মর্যাদা লাভ করে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন—“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যার চরিত্র উত্তম।” (বুখারী)

৪. জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ

উত্তম চরিত্রের গুণেই আল্লাহ তাআলা চরিত্রবান ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই দেবেন। মহানবী (স) বলেন, “আল্লাহ তাআলা যার গঠন ও স্বভাব সুন্দর করেছেন দোষখের আগুন তাকে ভক্ষণ করবে না।” (তাবারানী ও বায়হাকী)

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. আখলাকের অর্থ ও প্রকারভেদ।

২. উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব ও সুফল।

আমরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হব। আদর্শ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলব। আমাদের জীবন সার্থক হবে।

ক্ষমা (الْعَفْوُ)

পরিচয়

ক্ষমা (الْعَفْوُ) অর্থ মাফ করা, প্রতিশোধ না নেওয়া। ইসলামের পরিভাষায় প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে অপরাধীকে মাফ করে দেওয়ার নামই ক্ষমা।

তাৎপর্য

ক্ষমা আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অনেক নিআমত দান করেছেন। মানুষের সকল সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানুষ মূর্খতাবশত আল্লাহর কথা ভুলে যায়। তাঁর হুকুম অমান্য করে। তাঁর সাথে শিরক করে। এরপর যখন তারা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ পাক বলেন – “তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপ মোচন করেন।” (শূরা ৪২ : ২৫)।

আমাদের প্রিয় নবী (স) ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, “হে নবী! আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন।” (আরাফ ৭ : ১৯৯)।

তিনি আল্লাহর এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। খাইবার বিজয়ের পর এক ইয়াহুদী মহিলা মহানবী (স) কে দাওয়াত দেয় এবং তাঁকে বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত খেতে দেয়। তিনি কিছু খেতেই বিষক্রিয়া অনুভব করেন। ঐ মহিলাটি গোশতে বিষ দেওয়ার কথা স্বীকার করে। এরপরও দয়ালু নবী তাকে ক্ষমা করে দেন। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (স) তাঁর চিরশত্রুদের ক্ষমা করে দেন। তিনি তাদের বলেন, “আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। তোমরা মুক্ত, স্বাধীন।” পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষমার এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ক্ষমার গুরুত্ব অনেক। অপরাধীকে ক্ষমা করা হলে অপরাধী অনুতপ্ত হয়, লজ্জিত হয়। ক্ষমাকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।

আল্লাহ তা'আলাও ক্ষমাকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন— “যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ এবং শান্তির পথ অবলম্বন করে, তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর নিকট।” (শূরা ৪২ : ৪০)

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. ক্ষমার অর্থ ও সুফল।

২. মহানবী (স) এর ক্ষমার দৃষ্টান্ত।

আমরা ক্ষমার গুণে গুণান্বিত হব। অপরাধীকে ক্ষমা করব।

পরোপকার (الْإِحْسَانُ)

পরিচয়

পরোপকার (إِحْسَانٌ) অর্থ অন্যের উপকার করা। পরিভাষায়, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, সেগুলো উত্তমরূপে পালন করার নাম পরোপকার।

তাৎপর্য

পরোপকার আল্লাহ তাআলার একটি বড় গুণ। সকল সৃষ্টির প্রতি রয়েছে তাঁর অসীম দয়া ও করুণা। তিনি বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলের প্রতিই দয়া করেন। তিনি সকল মানুষকে সমান যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি। এ কারণে মানুষ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। তাই মানুষকে সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের উপকার করতে হবে।

পরোপকারের সুফল

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ

যে ব্যক্তি অন্যের উপকার করে আল্লাহ তাআলা তাকে ভালবাসেন। তিনি বলেন—

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

অর্থ : “তোমরা সৎকর্ম ও পরোপকার কর। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীল ও পরোপকারীদের ভালবাসেন।” (বাকারা ২ : ১৯৫)

২. শান্তি প্রতিষ্ঠা

পরোপকার দ্বারা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং ভাল কথা বলেও অপরের উপকার করা যায়। এতে সমাজে ঝগড়া-ফাসাদ দূর হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. বন্ধুত্ব অর্জন

পরোপকার দ্বারা কঠোর হৃদয়বিশিষ্ট লোকের অন্তরকেও জয় করা যায়। পরম শত্রুকে আপন করা যায়।

৪. আল্লাহর রহমত লাভ

আল্লাহর কোন সৃষ্টির প্রতি দয়া করলে তিনি দয়াকারী ব্যক্তির ওপর রহমত বর্ষণ করেন। মহানবী (স) বলেন, “যারা পৃথিবীতে আছে, তাঁদের প্রতি তোমরা দয়া কর। তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।”

(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

আমরা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির উপকার করব। আমরা বিপদে-আপদে, দুর্দিনে অপরের সাহায্য করব। তাদের খোঁজ-খবর নেব। এতে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি খুশি হবেন। আমরা তাঁর রহমত পাব।

শালীনতা (التَّهْذِيبُ)

পরিচয়

শালীনতা (تَهْذِيبٌ) অর্থ ভদ্রতা, নম্রতা ও লজ্জাশীলতা। চাল-চলনে, বেশ-ভূষায় ও কথা-বার্তায় মার্জিত পন্থা অবলম্বন করাকে শালীনতা বলে।

গুরুত্ব

শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মানুষের একটি মহৎ গুণ। শালীনতাবোধ মানুষকে অশ্লীল ও অবৈধ কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দা হতে সাহায্য করে। নারী-পুরুষ শালীনতার সাথে চরাফেরা করলে এবং শালীন পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করলে অনেক অঘটন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অশালীন পোশাক ও চাল-চলন অনেক সময় বিপর্যয় ডেকে আনে, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়। এতে মানুষ মন্দ চরিত্রের প্রতি প্রলুব্ধ হয়। শালীন ও ভদ্র আচরণের মাধ্যমে বন্ধুত্ব ও হৃদয়তা গড়ে উঠে। আর অশালীন আচরণ বন্ধুকেও দূরে সরিয়ে দেয়। মানুষ অশালীন ব্যক্তির সংস্পর্শ ত্যাগ করে। অশালীন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট নিকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ (স)

বলেন, “আল্লাহ তাআলার নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে খারাপ যার অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে ত্যাগ করে।” (বুখারী)। নবী কারীম (স) আরও বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ —

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ অশালীন ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।” (তিরমিযী)

হযরত লুক্‌মান (আ) তাঁর পুত্রকে শালীনতা শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, “অহঙ্কার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কর না। পৃথিবীতে উন্মত্তভাবে চল না, কারণ আল্লাহ কোন উন্মত্ত অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদচারণা কর সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্ৰীতিকর।” (লুক্‌মান ৩১ : ১৮-১৯)

এ পাঠে আমরা শিখলাম

১. শালীনতার গুরুত্ব।

২. অশালীনতার কুফল।

আমরা শালীনতার গুরুত্ব বুঝব। আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে শালীনতা অবলম্বন করে চলব। এতে জীবন সুন্দর হবে। সমাজে সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠবে।

(خِدْمَةُ الْخَلْقِ) সৃষ্টির সেবা

পরিচয়

সৃষ্টির সেবা (خِدْمَةُ الْخَلْقِ) অর্থ আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেবা করা। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি এ সব লালনপালন করেন। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির প্রতি যত্নবান ও মনোযোগী হওয়ার নামই সৃষ্টির সেবা।

তাৎপর্য

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাই সকল সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেক। মানুষ মানুষের ভাই। কাজেই কেউ ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত বা অভাবগ্রস্ত হলে তার প্রতি সদয় হতে হবে। তার অভাব মোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হবেন এবং আখিরাতে এর প্রতিদান দেবেন। নবী কারীম (স) বলেন, “যে মুসলমান অপর মুসলমানকে তার কাপড়ের অভাবের সময় কাপড় দান করে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে সবুজ বর্ণের পোশাক দান করবেন। যে মুসলমান অপর মুসলমানকে ক্ষুধার সময় খাদ্য দেয়, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের ফল দান করবেন। যে মুসলমান একজন মুসলমানকে পিপাসার সময় পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে সীলমোহর লাগানো পাত্র থেকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন।” (আবু দাউদ)।

আমাদের সমাজে অনেক ইয়াতীম, গরিব ও মিস্কীন আছে। যারা এ সকল গরিব মিস্কীনের প্রতি সদয় হয় আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ○

অর্থ : “খাবারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা মিস্কীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।” (দাহ্র ৭৬ : ৮)

সমাজের কোন ব্যক্তি পীড়িত হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে। কেউ ঋণগ্রস্ত হলে তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। এভাবে মুসলমান ভাইয়ের সেবা করলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে। নবী কারীম (স) বলেন, “যে মুসলমান অন্য মুসলমান ভাইয়ের অভাব পূরণ করে আল্লাহ তার অভাব পূরণ করেন।” (মুসলিম)

শুধু মানুষের সেবা করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। পশু-পাখি, কীট-পতংগ, গাছ-পালা, তরু-লতা সব কিছুর প্রতিই মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। কারণ এ সব কিছু মিলেই আমাদের পরিবেশ। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এ পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। এছাড়া আল্লাহ পাকের কোন সৃষ্টিই অযথা নয়। সব কিছুই তিনি আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী (স) পৃথিবীর সকল বস্তুই প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি সকল সৃষ্টির সেবার প্রতি আমাদের উৎসাহিত করে বলেন—

“সকল সৃষ্টিই আল্লাহ তাআলার পরিজন। সৃষ্টির মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় যে তাঁর পরিজনের প্রতি সদয়।” (বায়হাকী)

গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, কুকুর-বিড়াল সকল প্রাণীরই আমাদের মত ক্ষুধা পিপাসা আছে। এগুলোকে খেতে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। মহানবী (স) বলেন, “কোন এক মহিলা একটি বিড়াল বেঁধে রাখে। সে তাকে খেতে দেয় না এবং ছেড়েও দেয় না যাতে পোকা-মাকড় খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি বাঁধা অবস্থায় খাদ্য অভাবে মারা যায়। এ অপরাধের কারণে আল্লাহ তাআলা সেই মহিলাটিকে আযাব দেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

মহানবী (স) আরো বলেন, “বনী ইসরাঈলের এক পাপী মহিলা একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পিপাসায় কাতর দেখে পানি পান করায়। এতে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

জীব-জন্তুর সেবার পাশাপাশি বৃক্ষ-লতার প্রতিও সদয় হতে হবে। বিনা কারণে কোন গাছ কাটা যাবে না। গাছের পাতা ছেড়া যাবে না। কারণ গাছ-পালাও আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করে।

আমরা সৃষ্টির সেবা করব। কোন প্রাণীকে কষ্ট দেব না। গাছ লাগাব ও সংরক্ষণ করব। অকারণে কোন গাছ নষ্ট করব না।

আমানত (الْأَمَانَةُ)

পরিচয়

আমানত (الْأَمَانَةُ) অর্থ গচ্ছিত রাখা। কারও টাকা পয়সা বা মূল্যবান জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। যে গচ্ছিত সম্পদ স্বয়ত্ত্বে রেখে মালিকের কাছে যথাযথভাবে ফেরত দেয় তাকে আমানতদার বলে। আমানতের মাল আত্মসাৎ করাকে খিয়ানত বলে। আর আত্মসাৎকারীকে খিয়ানতকারী বলে।

প্রয়োজনীয়তা

মানব জীবনে আমানতের প্রয়োজনীয়তা অনেক। প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব তার নিকট পবিত্র আমানত। সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আমানত। তাদের লালন-পালন ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। দোকানের কর্মচারীদের হাতে দোকানটি মালিকের আমানত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র, লাইব্রেরীর বই-পুস্তক শিক্ষার্থীদের নিকট আমানত। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান ও চরিত্রগঠন শিক্ষকগণের নিকট পরিত্র আমানত। দেশের সম্পদ জনগণের হাতে আমানত।

প্রত্যেক কর্মচারীর নিকট তার বিভাগটি আমানত। দেশের সরকারের নিকট সমগ্র দেশ আমানত। আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (٧)

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।” (নিসা ৪ : ৫৮)

আমানতের খিয়ানত জঘন্য অপরাধ। নবী কারীম (স) খিয়ানতকে মুনাফিকের আলামত বলে উল্লেখ করেছেন। আমানত সম্পর্কে আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন—

“তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।” (বুখারী)

এ পাঠে আমরা শিখলাম

১. আমানতের অর্থ ও গুরুত্ব।

২. আমানতের প্রয়োজনীয়তা।

আমরা আমানতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করব। জীবনে সকল ক্ষেত্রে আমানতদার হব। আমানতদারীর সাথে সকল দায়িত্ব পালন করব।

শ্রমের মর্যাদা (شَرَفُ الْعَمَلِ)

আয় উপার্জন, মানুষের কল্যাণ এবং সৃষ্টির সেবামূলক যে কোন কাজকে শ্রম বলে। পরিশ্রম উন্নতি ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশি উন্নত।

শ্রমের মর্যাদা

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যধিক। আল্লাহ পাক বলেন – **وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى** ০

অর্থ : “মানুষ তাই পায় যা সে করে” (নাজম ৫৩ : ৩৯)। পরিশ্রম করে উপার্জন করা একটি ইবাদাত। মহানবী (স) বলেছেন –

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ –

অর্থ : “ফরয ইবাদাতের পর হালাল বুজি উপার্জন করা আর একটি ফরয ইবাদাত।” (বায়হাকী)

আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণের জন্য অগণিত সম্পদ রেখে দিয়েছেন। এ সম্পদ আহরণের জন্যে প্রয়োজন শ্রমের। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে আমরা জন্মগতভাবেই শ্রমের উপকরণগুলো লাভ করেছি। এগুলো হচ্ছে আমাদের হাত, পা ও মস্তিষ্ক। আর এগুলোই শ্রমশক্তি। এ শক্তি কাজে লাগানোর জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

“তিনি তো তোমাদের জন্য ভূমি সুগম করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেওয়া রিযিক থেকে আহার কর।” (মূলক ৬৭ : ১৫)। আমাদের প্রিয় নবী (স) শ্রমকে ভালবাসতেন। তিনি নিজে শ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। ছোট বেলায় তিনি পশু চরাণ। বড় হয়ে ব্যবসা করেন। খন্দক যুদ্ধে পরিখা খননে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

নবী দুলালী হযরত ফাতিমা (রা) নিজ হাতে যাঁতা ঘুরাতেন। যে কারণে তাঁর হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল। নিজেই পানির মশক বয়ে আনতেন। ফলে বুকে দড়ির দাগ পড়ে গিয়েছিল। নিজে ঝাড়ু দিতেন এতে তার কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে যেত। (আবু দাউদ)

শ্রমজীবীর মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন– **الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ**

অর্থ : “শ্রমজীবী আল্লাহর বন্ধু।” (বায়হাকী)। মহানবী (স) আরো বলেন– “নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতে কাজ করে খেতেন।” (বুখারী)

সাহাবীগণ একদিন নবী কারীম (স) কে জিজ্ঞেস করেন : “কোন প্রকার উপার্জন উত্তম?” নবী কারীম (স) এর জবাবে বলেন, “মানুষের নিজ হাতের কাজের বিনিময় এবং সং ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত মুনাফা।” (আহমাদ)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ জীবিকার জন্য পরিশ্রম করতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করতেন না। তাঁরা আমাদের জন্য শ্রমের মর্যাদার এক উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা শ্রমজীবীদের প্রশংসায় বলেন, “এমন বহুলোক আছে যারা জমিনের দিকে দিকে ভ্রমণ করে ও আল্লাহর অনুগ্রহ খুঁজে বেড়ায়।”

(মুয্যাম্মিল ৭৩ : ২০)

আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, “নামায শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর।” (জুমুআ ৬২ : ১০)

ইসলামে শ্রমিকের মজুরি সাথে সাথে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, “মজুরের মজুরি তার শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই আদায় করে দেবে।” (বায়হাকী)

আমরা শ্রমের মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত হব। নিজ হাতে কাজ করতে শেখব। আমরা স্বাবলম্বী হব।

সততা (الصِّدْقُ)

পরিচয়

সততা (صِدْقٌ) অর্থ সত্যবাদিতা, ন্যায্যপরায়ণতা, সাধুতা। কাজে-কর্মে, কথা-বার্তায়, লেনদেনে এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায্যনীতি অবলম্বন করাকে সততা বলে। সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলা, সুবিচার করা, অঙ্গীকার পালন করা, আমানত রক্ষা করা, প্রতারণা না করা সততার অন্তর্ভুক্ত।

গুরুত্ব

সততা একটি মহৎ গুণ। মানব জীবনের সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা সততার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সততার গুণেই নবীগণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে মহানবী (স) এ গুণেই সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। সততা মানুষকে আল্লাহ ভীতু করে। সৎলোক ন্যায্য-অন্যায্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। সৎব্যবসায়ী দ্রব্য ভেজাল দেয় না এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে না। সৎকর্মচারী কাজে ফাঁকি দেয় না। সৎলোক প্রতারণা করে না, প্রবঞ্চনা করে না।

সততা মানুষকে বিপদমুক্ত করে, সফলতা দান করে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, “তোমাদের কর্তব্য হল সত্যবাদিতা রক্ষা করা। কেননা সত্যবাদিতা পরম কল্যাণকর কাজের দিকে পরিচালিত করে। আর এ কল্যাণময় কাজই জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়।” (বুখারী ও মুসলিম)।

সততার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি সকলের বিশ্বাস অর্জন করে, শ্রদ্ধা লাভ করে, এমনকি পরম শত্রুও তাকে বিশ্বাস করে।

আমরা সততার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করব। নিজেদের জীবনে সততা অবলম্বন করব। আমরা সৎভাবে জীবনযাপন করব।

সৎ কাজে সহযোগিতা এবং অসৎ কাজে অসহযোগিতা

পরিচয়

সৎকাজ বলতে সদাচার, সত্য কথা, সেবা ও কল্যাণমূলক সবকিছুকেই বুঝায়। আন্তরিক শুভেচ্ছা, মৌখিক সমর্থন, কায়িক পরিশ্রম এবং আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে সৎ কাজে সহযোগিতা করা যায়। যেমন, দুস্থ ও পঙ্গুদের সাহায্য করা এবং তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এমনভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্কুল-মাদরাসা নির্মাণ করা, পুল নির্মাণ করা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ করা।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন— **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (ص)**

অর্থ : “আর তোমরা সৎ কাজ এবং তাকওয়ায় একে অপরের সাহায্য সহযোগিতা কর।” (মায়িদা ৫ : ২)

সৎ কাজে সহযোগিতা এবং অসৎ কাজে বাধা দেওয়ার জন্যই মুসলমানদের আবির্ভাব। আল্লাহ বলেন, “তোমারাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অসৎ কাজে বাধা দেবে।” (আলে-ইমরান ৩ : ১১০)

সৎ কাজে সহযোগিতা করলে কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন—

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ۝

অর্থ : “সৎ কাজের পথ প্রদর্শনকারী ঐ কাজ সম্পাদনকারীর মত সাওয়াব পাবে।” (মুসলিম)

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, “যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দিল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদ পরিবার পরিজনদের সাথে তার অনুপস্থিতিতে ভাল ব্যবহার করল, সেও যেন জিহাদ করল।” (বুখারী)

সমাজে যেমন ভাল লোক থাকে, তেমনি কিছু মন্দ লোকও থাকে, তারা অসৎ কাজে লিপ্ত থাকে, সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ ধরনের লোক সমাজ ও দেশের দুশমন। এদের কোন কাজে সহযোগিতা করা ঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (ص)

অর্থ : “তোমরা পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা কর না।” (মায়িদা ৫ : ২)

সমাজে একজন অন্যায় করলে সজো সজো তাকে বাধা দিতে হবে। নচেৎ তার দেখাদেখি অন্যরাও সে অন্যায় কাজটি করে ফেলতে পারে। মহানবী (স) বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ কাউকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখে, তখন তাকে হাত দিয়ে বাধা দেবে। যদি তাতে অপারগ হও, তবে মুখে বাধা দেবে। আর যদি তাও না পার, তবে অন্তরের সাথে ঘৃণা করবে। আর এটাই হল দুর্বলতম ঈমানের পরিচয়।” (মুসলিম)

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. সৎ কাজে সহযোগিতার সুফল।

২. অসৎ কাজে সহযোগিতার কুফল।

আমরা সৎ কাজে সহযোগিতা করব। অসৎ কাজে কখনও সহায়তা করব না। যারা অসৎ কাজ করে, তাদের বাধা দেওয়ার আশ্রয় চেষ্টা করব।

أَخْلَاقُ ذَمِيمَةٌ (আখ্লাকে যামীমা)

যেসব অসৎ কাজ মানুষকে হীন, নীচ ও নিন্দনীয় করে তোলে তাকে আখ্লাকে যামীমা বা নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন, হিংসা, ক্রোধ, লোভ, প্রতারণা, ছিনতাই, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, খিয়ানত করা ইত্যাদি। আখ্লাকে যামীমা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তোলে। এ চরিত্রের অধিকারীকে কেউ পছন্দ করে না, শ্রদ্ধা করে না। সে দুনিয়া ও আখিরাতে ঘৃণিত-অভিশপ্ত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, “বান্দা তার কুচরিত্রের কারণে জাহান্নামের নিম্নস্তরে পৌঁছে যায়।” (তাবারানী)

هِنْسَا (أَلْحَسَدُ)

পরিচয়

হিংসা (أَلْحَسَدُ) অর্থ ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা। অপরের ধন-সম্পদ, মান-সম্মান অপছন্দ করে এবং তা বিলুপ্তির কামনা করাকে হিংসা বলে। যেমন, ধনী ব্যক্তির ধন-দৌলত, কারও ভাল ফলাফল বা উচ্চ মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া এবং তার ধ্বংস কামনা করা।

অপকারিতা

হিংসা একটি মারাত্মক মানসিক রোগ। হিংসার অপকারিতা অনেক। মানব সৃষ্টির পর হিংসার কারণেই সর্বপ্রথম পাপ সংঘটিত হয়। ইবলীস্ হযরত আদম (আ) এর পদমর্যাদা দেখে তাঁর প্রতি হিংসা করে। ফলে সে অভিশপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। আদম (আ) এর পুত্র কাবিল তার আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে এ হিংসার বশবর্তী হয়েই।

হিংসা মানুষের নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন—

إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ—

অর্থ : “হিংসা পুণ্যকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যেমন আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়।” (ইবন মাজাহ)

হিংসা মনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখে। হিংসুক নিজেই এ আগুনে জ্বলতে থাকে। হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহ এবং মানুষের কাছে ঘৃণিত। তাকে কেউই ভালবাসে না। কেউই তার বশুত্ব কামনা করে না। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে।

হিংসা মানুষের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে। এতে সমাজে ঝগড়া ফাসাদ এবং মারামারি সৃষ্টি হয়। সমাজে অশান্তি নেমে আসে। হিংসা মানুষের মনে অহঙ্কার সৃষ্টি করে। আর এ অহঙ্কারই পতনের মূল।

হিংসা বর্জনকারী আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। সে সহজে জান্নাত লাভ করবে। একবার রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর একজন সাহাবীকে জান্নাতের অধিকারী বলে উল্লেখ করেন। তিনি কী আমল করেন এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি বলেন, “আল্লাহ তাআলা যাকে কোন উত্তম বস্তু দান করেছেন আমি তার প্রতি কখনও হিংসা পোষণ করি না।” (ইবন মাজাহ)

আমরা হিংসার কুফল সম্পর্কে সচেতন থাকব। কারও প্রতি হিংসা পোষণ করব না। এতে আমাদের মন প্রফুল্ল থাকবে। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

(الْغَضَبُ) ক্রোধ

পরিচয়

ক্রোধ (غَضَبٌ) অর্থ রাগ বা গোম্বা। স্বার্থহানি বা কারও দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় মানুষের মধ্যে যে রাগের সৃষ্টি হয় তাকে ক্রোধ বলে। অহঙ্কার, তিরস্কার, ঝগড়া প্রভৃতি কারণে ক্রোধের সৃষ্টি হয়।

অপকারিতা

ক্রোধ অত্যন্ত নিন্দনীয় চরিত্র। ক্রোধ মানুষের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আর হিংসা মানুষের নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। ক্রোধের কারণে অনেক সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। সে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। ক্রোধ যখন সীমা অতিক্রম করে তখন তা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। এতে অনেক অঘটন ঘটে যায়। ক্রোধ ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়। মহানবী (স) বলেন, “সিরকা মধুকে যেভাবে বিনাশ করে, ক্রোধও ঈমানকে তদ্রূপ নষ্ট করে।” (বায়হাকী)

ক্রোধ সংবরণ করলে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে জানতে চাইলেন, কোন কাজ তাঁকে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, “তুমি রাগ করবে না।” (তাবারানী)

ক্রোধ সংবরণ করা একটি নেক কাজ। জনৈক সাহাবী মহানবী (স) কে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে একটি ভাল কাজের নির্দেশ দিন।” রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, “তুমি রাগ করবে না।” (বুখারী)

ক্রোধ সংবরণ একটি বীরত্বপূর্ণ কাজ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, “কুস্তিযুদ্ধে যে বিপক্ষকে পরাস্ত করে সে প্রকৃত বীর নয়, বরং ক্রোধের সময় যে নিজেকে বশে রাখতে পারে, সেই প্রকৃত বীর। (বুখারী)

আমরা ক্রোধের অপকারিতা উপলব্ধি করব। ক্রোধ বর্জন করে চলব, এতে আমরা সুখে থাকব। সমাজে শান্তি বিরাজ করবে।

(الْحَرَمُ) লোভ

পরিচয়

লোভ (حَرَمٌ) অর্থ লালসা, লিপ্সা। অতিরিক্ত পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে লোভ বলে। লোভ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- অর্থ-সম্পদের লোভ, পদমর্যাদার লোভ, খাদ্যদ্রব্যের লোভ, পোশাক-পরিচ্ছদের লোভ ইত্যাদি।

কুফল

লোভ মনের শান্তি নষ্ট করে। লোভী ব্যক্তি নিজের নিকট যা আছে তাতে তুষ্ট না থেকে আরও পাওয়ার আশায় অস্থির থাকে। লোভের কারণে মানুষ নানা প্রকার অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়। ডাকাতি, রাহাজানি, কালোবাজারি, মজুদদারি,

হিনতাই, দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া, সুদ-ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ লোভের কারণেই সংঘটিত হয়। খাদ্যের লোভে মানুষ মাত্রাতিরিক্ত খায়। এতে সে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এমনকি তা কখনও জীবন নাশের কারণ হয়। কথায় বলে, “লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।”

লোভ থেকে বাঁচার উপায়

ধৈর্য এবং অল্পে তৃষ্টির গুণ থাকলে লোভ-লালসা থেকে বাঁচা যায়। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সহজ সরল পথ অবলম্বন করলে লোভ বর্জন করা সম্ভব হয়। তাকদীরের ওপর বিশ্বাস রাখা লোভ দমনের প্রধান উপায়। নবী কারীম (স) বলেন, “হে মানব মডলী! তোমরা চাওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম পথ অবলম্বন কর। কেননা বান্দার ভাগ্যে যা নির্ধারিত আছে তার অতিরিক্ত সে পাবে না।” (হাকিম)

আমরা লোভের কুফল জানব। লোভ বর্জন করব। তাকদীরের ওপর ঈমান রাখব। যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকব। আমরা সুখি হব।

প্রতারণা (الْغَشِّ)

পরিচয়

প্রতারণা (غَشٍّ) অর্থ প্রবঞ্চনা, ধোঁকা দেওয়া, কাউকে ঠকান। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধোঁকা দেওয়াকে প্রতারণা বলে। অজ্ঞীকার ভঙ্গা করা, পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে বিক্রি করা ইত্যাদি বড় ধরনের প্রতারণা।

কুফল

প্রতারণা একটি সামাজিক অপরাধ। এর ফলে সমাজের মানুষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। প্রতারণাকারী খাঁটি মুসলমান নয়। রাসূলুল্লাহ (স) একদিন বাজারে গিয়ে খাদ্যদ্রব্যের একটি বড় স্তূপ দেখতে পান। স্তূপটির উপরিভাগের দ্রব্য শূকনো ছিল। ভেতরের অংশও শূকনো আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি স্তূপের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেন। তখন দেখা গেল ভেতরের অংশ ভেজা। মহানবী (স) মালিকের নিকট এর কারণ জানতে চান। মালিক জানাল, তাতে বৃষ্টি পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, “তুমি ভেজা খাদ্য উপরে রাখলে না কেন যাতে লোকেরা তা দেখতে পেত?” নবী কারীম (স) তখন আরো বললেন –

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا —

অর্থ : “যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মাত নয়।” (তিরমিযি)

প্রতারণা মুনাফিকের কাজ। মুনাফিকের শাস্তি বড়ই কঠোর। সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি কখনও প্রতারণার আশ্রয় নেয় না। অজ্ঞীকার ভঙ্গা করে না। মানুষকে ধোঁকা দেয় না।

আমরা প্রতারণার কুফল উপলব্ধি করব। কখনও একাজে লিপ্ত হব না। তবে সমাজে শান্তি স্থাপিত হবে।

হিনতাই (الْإِنْتِهَابُ)

পরিচয়

বলপূর্বক অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়াকে হিনতাই বলে। হিনতাই একটি সমাজবিরোধী অপরাধ।

কুফল

হিনতাইয়ের কুফল অনেক :

১. হিনতাই সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে।

২. এটা সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে।
 ৩. এর ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। মানুষ অর্থ-সম্পদ, মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে চলাচল করতে ভয় পায়।
 ৪. এর ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।
 ৫. যে ছিনতাই করে তার পূর্ণ ঈমান থাকে না। মহানবী (স) বলেন, “কোন ব্যক্তি খোলাখুলিভাবে মানুষের সামনে ছিনতাই ও লুটতরাজ করলে সে মুমিন থাকে না।” (আবু দাউদ)
- ছিনতাই বর্বর যুগের চরিত্রবিশেষ। ইসলাম এ বর্বরতাকে সমূলে উৎপাটন করার লক্ষ্যে ঘোষণা করেছে—

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ ۝

অর্থ: “ইসলামী বিধানে না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নিয়ম আছে, না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নীতি আছে।” ইসলামে এ ধরনের অপরাধের শাস্তি অতি কঠোর। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ছিনতাই, ডাকাতি, লুটতরাজ ইত্যাদি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অপকর্মের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের প্রবর্তিত শাস্তির বিধান সমাজে যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে ছিনতাইয়ের মত একটি জঘন্য অপরাধ থেকে মানুষ বিরত থাকবে।

আমরা ছিনতাইয়ের কুফল অনুধাবন করব। এ ধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত হব না। যারা এরূপ কাজ করে তাদের প্রতিহত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ (পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া)

পরিচয়

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বলতে বুঝায়, পিতা-মাতার কথামত না চলা, তাঁদের নির্দেশ অমান্য করা। আল্লাহর অনুগ্রহের পর সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তাঁরা সন্তানের আপনজন। তাঁদের স্নেহ-মমতায় সন্তানরা লালিত-পালিত হয়। সন্তানদের আরাম আয়েশের জন্য তাঁরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাঁরা সব রকম ব্যবস্থা করেন। কাজেই সন্তানের কর্তব্য হল পিতা-মাতার বাধ্য থাকা।

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া জঘন্য অপরাধ। এর অপকারিতা অনেক :

১. শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হল পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।
২. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পাপ এত ভয়াবহ যে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এ পাপ ক্ষমা করেন না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, “মহান আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সকল পাপই ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার পাপ তিনি ক্ষমা করেন না।” (বায়হাকী)
৩. পিতা-মাতার অবাধ্য হলে পরকালে জাহান্নামের কঠিন আগুনে জ্বলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, “তরাই (পিতা-মাতা) তোমার বেহেশত ও দোখ।” (ইবন মাজাহ)। অর্থাৎ পিতা-মাতার সন্তুষ্টির ওপর যেমন সন্তানের জান্নাত লাভ নির্ভর করে, ঠিক তেমনি তাঁদের অসন্তুষ্টির কারণে সন্তান দোখবাসী হবে। নবী কারীম (স) আরও বলেন, “তার সর্বনাশ হোক, তার সর্বনাশ হোক”। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! সে কে ? তখন তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি পিতা-মাতা যে কোন একজনকে অথবা উভয়কে বৃন্দ অবস্থায় পেল, তবুও সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারল না।” (মুসলিম)
৪. মাতার অবাধ্য হওয়াকে আল্লাহ তাআলা হারাম ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ —

অর্থ : “আল্লাহ তোমাদের জন্য মায়াদের অবাধ্য হওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।” (বুখারী)

৫. পিতা সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্টি হলে আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি অসন্তুষ্টি হন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, “পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।” (তিরমিযী)

পিতা-মাতা সন্তানের কল্যাণেই কখনও তাদের শাসন করেন বা কড়া কথা বলেন। এটা সন্তানকে মেনে নিতে হবে। এতে তার ভবিষ্যৎ সুখময় হবে।

আমরা পিতা-মাতার আদেশ নিষেধ মেনে চলব। এতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন। আল্লাহও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আল্লাহ তাআলা ক্ষমাকারী—

ক. অপরাধ ক্ষমা করে দেন

গ. কবর আযাব মারফ করে দেন

খ. মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন

ঘ. হাশরের বিচার সহজ করে দেন

২। খিদমতে খালক অর্থ—

ক. সৃষ্টির সেবা

গ. মানুষের সেবা

খ. প্রাণীর সেবা

ঘ. পশু-পাখির সেবা

৩। আমানতের খিয়ানত করা—

ক. অপরাধ

গ. মাকরুহ

খ. সামান্য অপরাধ

ঘ. জঘন্য অপরাধ

৪। হিংসা মানুষের নেক আমলকে—

ক. জ্বালিয়ে দেয়

গ. তাড়িয়ে দেয়

খ. বাধা দেয়

ঘ. ধ্বংস করে দেয়

৫। ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখাকে বলা হয়—

ক. আত্মসংযমী

গ. প্রকৃত বীর

খ. চরিত্রবান

ঘ. আত্মপ্রত্যয়ী

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

এনাম ও জাহিদ দুই বন্ধু। জাহিদ এনামের নিকট কিছু টাকা আমানত রেখেছে। কিছু দিন পর জাহিদ টাকা ফেরৎ চাইলে এনাম আরেক দিন দেবে বলে জানায়। জাহিদ পুনরায় টাকা চাইতে গেলে এনাম বলে, আমি এখন টাকা দিতে পারব না।

৬। শরীআতের দৃষ্টিতে এনামের কাজটি—

ক. অন্যায়

গ. আমানতের খেয়ানত

খ. ওয়াদা খেলাপ

ঘ. ভদ্রতার খেলাপ

৭। আমানত বলতে বোঝান হয়েছে—

ক. কিছুদিন পরে টাকা ফেরৎ দেয়া যাবে

খ. একবার ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয়বার অবশ্যই ফেরৎ দেবে

গ. টাকা যে অবস্থায় রেখেছে সে অবস্থায় ফেরৎ দেবে

ঘ. বুঝিয়ে বলে টাকা কিছুদিন ব্যবহার করার পর ফেরৎ দেবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। তোফাজ্জল সাহেব একটি গার্মেন্টস শিল্পের মালিক। অনেক শ্রমিক তার প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। তারা তাদের প্রাপ্য ঠিকভাবে পায়না। এ নিয়ে শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং তারা একদিন কাজে বিরত থাকে। তোফাজ্জল সাহেব তার এক বন্ধুর সাথে আলাপ করলে তিনি বলেন, “শ্রমিকদের হক বড় ভয়ের বিষয়। তোমাকে শ্রমের মর্যাদা বুঝতে হবে। কারণ, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের হক তোমার কাছ থেকে আদায় করে নেবেন।” হাদীসে আছে, “মজুরের মজুরী তার ঘাম শুকানোর আগেই পরিশোধ করে দাও।”
 - ক. শ্রম কী ?
 - খ. শ্রমের মর্যাদা বলতে কী বোঝানো হয়েছে, ব্যাখ্যা কর।
 - গ. তোফাজ্জল সাহেব শ্রমিকের মজুরী ঠিকভাবে না দেওয়ায় কী অন্যায় হয়েছে, ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. শ্রমিকের মজুরী ঘাম শুকানোর আগেই পরিশোধের কথা বলা হয়েছে কেন, ব্যাখ্যা কর।
- ২। মালিহা ও রাবেয়া সহপাঠী। মালিহা সব সময় সত্য কথা বলে। কিন্তু রাবেয়া তেমন নয়। রাবেয়াকে ক্লাসের কাজ সম্পর্কে জানতে চাইলে বলে—করেছি, দেখতে চাইলে দেখাতে পারে না। একদিন মালিহা রাবেয়ার কাছে জবুরি প্রয়োজনে দশ টাকা ধার চাইলে সে বলে নেই অথচ টিফিন পিরিয়ডে আচার কিনার সময় রাবেয়ার হাতে কয়েকটি দশ টাকার নোট দেখা গেল। এ প্রসঙ্গে মালিহা বলে হাদীসে আছে, তোমরা সত্যবাদিতা রক্ষা কর।
 - ক. সিন্দুক শব্দের অর্থ কী ?
 - খ. সত্যবাদিতা বলতে কী বোঝ ?
 - গ. রাবেয়ার কাজগুলোকে সত্যবাদিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. “তোমরা সত্যবাদিতা রক্ষা কর”—এই হাদীসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
- ৩। হাসান ও ফায়েজ দু’জন প্রতিবেশী। তাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। একদিন হাসানের একটি ছাগল ফায়েজের বাগানে ঢুকে কিছু গাছ খেয়ে ফেলে। ফায়েজ ক্রুদ্ধ হয়ে ছাগলটিকে মারতে মারতে দুটো পা ভেঙে দেয়। ফলে তাদের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়। বিষয়টি নিয়ে ভাবতে গিয়ে হাসানের একটি হাদীস মনে পড়ে, “সিরকা মধুকে যেভাবে বিনাশ করে, ক্রোধও ঈমানকে তদুপ নষ্ট করে।”
 - ক. ক্রোধ অর্থ কী ?
 - খ. ক্রোধের একটি ক্ষতিকর অবস্থা ব্যাখ্যা কর।
 - গ. ক্রোধ সংবরণ করতে ফায়েজকে কী কী উপদেশ দেয়া যেতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. “সিরকা মধুকে যেভাবে বিনাশ করে ক্রোধ ও ঈমানকে তদুপ নষ্ট করে”—হাদীসটি বিশ্লেষণ কর।

আদর্শ জীবনচরিত

হযরত ইসমাঈল (আ)

পরিচয়

হযরত ইসমাঈল (আ) ছিলেন বিশিষ্ট নবী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র। তাঁর মাতার নাম বিবি হাযিরা। হযরত ইবরাহীম (আ) এর বয়স যখন ছিয়াশি তখন হযরত ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন।

নির্বাসন

আল্লাহর কি মহিমা! তিনি ইবরাহীম (আ) কে নির্দেশ দিলেন, শিশু পুত্রসহ হাযিরাকে নির্বাসন দিতে। তাই তিনি জনমানবহীন মক্কা উপত্যকায় তাঁদের নির্বাসন দেন। খাদ্য হিসেবে রেখে যান শুধু কিছু খেজুর আর এক মশক পানি।

কয়েকদিনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) এর রেখে যাওয়া খেজুর ও পানি ফুরিয়ে গেল। বিবি হাযিরা ও শিশু ইসমাঈল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন। পানির পিপাসায় শিশু পুত্র ইসমাঈলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তা দেখে মা হাযিরা পানির জন্য সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উদভ্রান্তের ন্যায় ছুটাছুটি করতে লাগলেন। এদিকে ইসমাঈল তৃষ্ণায় হাত-পা ছুড়াছুড়ি করছিলেন, হঠাৎ করেই পায়ের কাছ থেকে পানি উঠতে লাগল। মা হাযিরা তা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং ইসমাঈলকে পানি পান করিয়ে জীবন রক্ষা করলেন। শোকরিয়া জানালেন আল্লাহর নিকট। অলৌকিকভাবে পানি ওঠার স্থানে একটি কূপ সৃষ্টি হয়ে গেল, যার নাম যমযম কূপ। পানি প্রাপ্তির কারণে আস্তে আস্তে সেখানে বিভিন্ন দিক থেকে মানুষ আসতে লাগল। চারপাশে জনবসতি গড়ে উঠল।

কুরবানী

হযরত ইবরাহীম (আ) সুদূর সিরিয়া থেকে মাঝে মাঝে বিবি হাযিরা ও পুত্র ইসমাঈলকে দেখতে আসতেন। একবার এসে তিনি ইসমাঈলকে জানালেন যে, আল্লাহ তাঁকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন তাঁর ইচ্ছা কী? ইসমাঈলের বয়স তখন ১৩ বছর। ইসমাঈল বলেন, “আব্বা! আমি আপনার যে কোন নির্দেশ মেনে নেব। আল্লাহর নির্দেশ আপনি পালন করুন।” হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈলকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তাঁর গলায় ছুরি চালাতে লাগলেন। অলৌকিকভাবে একটি দুম্বা কুরবানী হয়ে গেল, আর ইসমাঈল জীবিত থেকে গেলেন। এদিন থেকেই পশু কুরবানীর রীতি প্রচলিত হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইসমাঈলের কুরবানীর কথা উল্লেখ করেছেন—

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ط قَالَ يَآبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

অর্থ : “এরপর সে (ইসমাঈল) যখন পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হলেন, তখন (তিনি) বললেন, হে বৎস! স্বপ্নে আমি তোমাকে যবেহু করতে দেখেছি এ বিষয়ে তোমার মতামত কী? ইসমাঈল বলেন, আব্বা! আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা সম্পন্ন করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।” (সাফ্যাত ৩৭ : ১০২)

কা'বা ঘর নির্মাণে অংশগ্রহণ

আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা নির্মাণ করেন। তখন ইসমাঈল (আ) তাঁকে সর্বাত্মক সাহায্য করেন।

উপাধি

ইসমাঈল (আ) ছিলেন উঁচু মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তাঁকে ওয়াদা পালনকারী উপাধি দেন। কথিত আছে তিনি এক ব্যক্তির সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, ঐ লোকটি নির্ধারিত স্থানে না আসা পর্যন্ত তিনি তার জন্য অপেক্ষা করবেন। কিন্তু লোকটি কথামত না আসলেও হযরত ইসমাঈল (আ) তিন দিন পর্যন্ত সে স্থানে তার জন্য অপেক্ষা করেন।

বংশধর

হযরত ইসমাঈল (আ) এর বংশধরগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। বিখ্যাত কুরাইশ বংশ তাঁরই বংশধর। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) হযরত ইসমাঈল (আ) এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ইনতিকাল

একশত ছত্রিশ বছর বয়সে হযরত ইসমাঈল (আ) মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) এর পরিচয়।
২. হযরত ইসমাঈল (আ) এর আল্লাহর রাস্তায় ত্যাগ ও কুরবানীর ইতিহাস।

আমরা হযরত ইসমাঈল (আ) এর জীবন ইতিহাস জানব ও বলতে পারব। আমরা তাঁর জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হব। আমরা আমাদের পিতামাতার নির্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেব। এতে তাঁরা খুশি হবেন। আল্লাহর রহমত আমাদের ওপর বর্ষিত হবে।

হযরত ইউসুফ (আ)

পরিচয়

কেনানের অধিবাসী বিখ্যাত নবী হযরত ইউসুফ (আ) হযরত ইয়া'কূব (আ) এর পুত্র। হযরত ইউসুফ (আ) ছিলেন বারো ভাইয়ের একাদশতম। তিনি ছিলেন অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী, বিনয়ী ও উত্তম চরিত্রগুণে গুণাবিত।

ভাইদের ষড়যন্ত্র

পিতা হযরত ইয়া'কূব (আ) পুত্রদের মধ্যে ইউসুফকে বেশি ভালবাসতেন। এ কারণে ভাইয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা ষড়যন্ত্র করে একদিন পিতার নিকট খেলার কথা বলে ইউসুফকে জনমানবশূন্য একটি মাঠে নিয়ে যায়। তারা তাঁকে মারপিট করে একটি গভীর কূপে ফেলে দেয়। বাড়ি এসে পিতাকে জানায়, “আমরা যখন খেলাধুলায় লিপ্ত ছিলাম, তখন ইউসুফকে বাঘে নিয়ে যায় এবং খেয়ে ফেলে। এই যে দেখুন, তার রক্তমাখা জামা।” জামাটি রক্তমাখা থাকলেও ছেঁড়া ছিল না। ইয়া'কূব (আ) পুত্রদের এ কথায় বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি তাদের এ মিথ্যা কথায় অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। ক্রোধ প্রকাশ করলেন না বরং ধৈর্যধারণ করার সংকল্প করে বললেন, “ধৈর্যই উত্তম, আর তোমরা যা প্রকাশ করেছ সে বিষয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করছি।” (ইউসুফ ১২ : ১৮)

বাজারে বিক্রয়

যে কূপে ইউসুফকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল ঐ কূপের পাশ দিয়ে একটি বণিক দল মিসর যাচ্ছিল। তারা পানি ওঠানোর জন্য কূপে বালতি ফেললে ইউসুফ বালতিটির রশি ধরে ওপরে উঠে আসলেন। বণিকেরা ইউসুফকে মিসরে নিয়ে ক্রীতদাস বলে মিসরের অর্থমন্ত্রী আযীয এর নিকট বিক্রি করে দেয়। আযীয ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি দাস হিসেবে

ইউসুফকে ক্রয় করলেও পুত্রের মত আদর যত্নে লালন-পালন করতে থাকেন। যুবক বয়সে মিথ্যা অপবাদের দরুন ইউসুফ কারাবন্দ হন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে কারাগারে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাও বলতে পারতেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা

মিসরের বাদশাহ একবার এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখতে পান যে, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী খেয়ে ফেলছে। আরও দেখতে পান সাতটি সবুজ শস্য শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দরবারের আমীর-ওমরা, জ্ঞানী-গুণী কেউই দিতে পারলেন না। অবশেষে তিনি হযরত ইউসুফের শরণাপন্ন হলেন। ইউসুফ (আ) এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন—সাত বছর রাজ্যে প্রচুর ফসল ফলবে, সম্বলতা থাকবে, আর সাত বছর একটানা ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলবে। তিনি দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার উপায়ও বলে দিলেন। উদ্বৃত্ত খাদ্য জমা করে রাখার পরামর্শ দিলেন। ইউসুফ (আ) এর ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ খুবই মুগ্ধ হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলেন। তাঁকে সম্মানের সাথে রাজদরবারে স্থান দিলেন।

মন্ত্রী পদে নিয়োগ

বাদশাহ ইউসুফ (আ) কে অর্থমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। এদিকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে ইউসুফ (আ) এর ভাইয়েরা তিনবার খাদ্যশস্যের জন্য মিসরে হাজির হয়। ইউসুফ (আ) প্রথম বারেই তাদের চিনে ফেলেন। নিজের পরিচয় গোপন রাখেন। মানবিক কারণে তিনি প্রত্যেকবারই তাদের জন্য পূর্ণ খাদ্যশস্য বরাদ্দ করেন। দ্বিতীয়বার কৌশলে আপন সহোদরকে নিজের কাছে রেখে দেন। তৃতীয়বার ইউসুফ (আ) ভাইদের নিকট আত্মপরিচয় দেন। তখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বলে, “আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম।” ইউসুফ (আ) ভাইদের ক্ষমা করে দরদভরা কণ্ঠে বলেন—

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ز وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝

অর্থ : “আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু।” (ইউসুফ ১২ : ৯২)

এরপর ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে পিতা ও পরিবারের লোকজনসহ মিসরে আসবার আমন্ত্রণ জানান। পিতামাতা ও অন্যদের নিয়ে ভাইয়েরা মিসরে আগমন করেন। ইউসুফ (আ) তাঁদের সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। মিলেমিশে সকলে বসবাস করতে থাকেন। ১১০ বছর বয়সে হযরত ইউসুফ (আ) ইনতিকাল করেন।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. হযরত ইউসুফ (আ) এর পরিচয়।
২. হযরত ইউসুফ (আ) এর ক্ষমার দৃষ্টান্ত।
৩. কঠিন বিপদে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখলে ধৈর্যের ফল পাওয়া যায়।

আমরা হযরত ইউসুফ (আ) এর জীবন কাহিনী জানব ও বলতে পারব। আমরা তাঁর ক্ষমার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হব।

হযরত আয্যুব (আ)

পরিচয়

হযরত আয্যুব (আ) ছিলেন একজন বিখ্যাত নবী। তিনি ছিলেন অগাধ সম্পদের মালিক। আল্লাহ তাআলা তাঁর ঈমান ও ধৈর্য পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাঁর সকল সম্পদ, ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা, ফলের বাগান, সব কিছু বিনষ্ট হয়ে গেল। তিনি নিঃস্ব হয়ে গেলেন। তাঁর সাত কন্যা ও সাত পুত্র সকলেই মৃত্যুবরণ করল। এতসব কিছু ঘটলেও তিনি ধৈর্যহারা হলেন না। তিনি আগের মত ইবাদাত বন্দেগীতেই রত থাকলেন। সবশেষে তাঁর শরীরে ক্ষত রোগ দেখা দিল। শরীরের মাংস পচে গলে পড়তে শুরু করল। শরীরে পোকা ধরল। গ্রামের লোকেরা তাঁকে গ্রাম ছেড়ে যেতে বলল। আত্মীয়-স্বজন সকলে তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল। কিন্তু সঙ্গে থেকে গেলেন সতী-স্বাধী স্ত্রী রহীমা। তিনি তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে থাকলেন। গ্রামের লোকদের ভয় ও অবজ্ঞার মুখে বিবি রহীমা আল্লাহর নবীকে নিয়ে গ্রামের বাইরে এক স্থানে আশ্রয় নিলেন। স্ত্রী মেহনতের মজুরি দিয়ে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন। এভাবে চলে গেল সাত বছর কয়েক মাস। আয্যুব (আ) সব দুঃখ-কষ্ট সন্তুষ্টচিত্তে সহ্য করে আল্লাহর যিক্রের মশগুল থাকতেন। এজন্য আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি, কতই না উত্তম বান্দা তিনি। তিনি ছিলেন আমার অভিমুখী।” (সাদ ৩৮ : ৪৪)

রোগমুক্তি

রোগযন্ত্রণায় ভীষণ কাতর হয়ে এক পর্যায়ে হযরত আয্যুব (আ) আল্লাহর নিকট রোগমুক্তির জন্য দুআ করলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—

“এবং স্মরণ করুন আয্যুবের কথা, যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেন, ‘আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি, আপনিতো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।’” (আম্বিয়া ২১ : ৮৩)

আল্লাহ তাআলা আয্যুব (আ) এর দুআ কবুল করলেন। তিনি তাকে পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে বললেন। আঘাতের সাথে সাথে তাঁর পায়ের নিকট থেকে পানি উঠতে লাগল এবং কূপের সৃষ্টি হল। আয্যুব (আ) ঐ পানি পান করলেন এবং এর দ্বারা গোসল করলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সব রোগ ভাল হয়ে গেল। পূর্বের ন্যায় শরীর সুস্থ হয়ে ওঠল, এমনকি রোগের চিহ্নও থাকল না। এরপর আল্লাহ তাঁর বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সকল সম্পদ পুনরায় ফিরিয়ে দিলেন। হযরত আয্যুব (আ) নতুন করে আল্লাহর দীন প্রচার করতে শুরু করলেন। রোগমুক্তির পর তিনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. হযরত আয্যুব (আ) এর পরিচয়।

২. কঠিন বিপদে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তার প্রতিদান দেন।

আমরা হযরত আয্যুব (আ) এর পরিচয় জানব ও বলতে পারব। আমরা তাঁর জীবন থেকে বিপদে ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা গ্রহণ করব।

হযরত মুহাম্মাদ (স)

পরিচয়

আরবের কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম আমেনা। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন এবং ছয় বছর বয়সে মাতাও ইন্তেকাল করেন। শৈশবে তিনি দাদা আবদুল মুতালিব ও চাচা আবু তালিবের নিকট লালিতপালিত হন।

ধর্ম প্রচার

হযরত মুহাম্মাদ (স) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে প্রথম নিকট আত্মীয় স্বজনের কাছে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিতে লাগলেন। তাঁর দাওয়াতে প্রথমে হযরত খাদীজা (রা), এরপর হযরত আলী (রা) ও হযরত আবু বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময়ে মহানবী (স) গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এরপর আল্লাহ তাঁকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন। তখন তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। একদিন তিনি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে সকলের উদ্দেশে বললেন, “আমি যদি বলি, এ পাহাড়ের ওপাশে বিরাট শত্রু বাহিনী তোমাদের ওপর হামলার অপেক্ষায় আছে, তাহলে তোমরা বিশ্বাস করবে?” সবাই বলল, “তুমি আল-আমিন, তোমার কথা অবশ্যই বিশ্বাস করব।” মহানবী (স) বললেন, “এক আল্লাহর ওপর ঈমান আন, তোমরা মুক্তি পাবে।” এ কথা শোনামাত্র সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠল। আবু লাহাব বলল, “তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এজন্যই আমাদের ডেকেছ?” তারা তাঁকে গালমন্দ দিতে দিতে চলে গেল। তাঁর বিরোধিতা আরম্ভ করল। তাঁকে পাগল ও যাদুকর আখ্যা দিল। তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের ওপর নানারকম অত্যাচার নির্যাতন চালাতে লাগল।

মি'রাজ

মক্কার কাফিরদের সীমাহীন অত্যাচারে এবং তায়িফবাসীদের দুর্ব্যবহারে মহানবী (স) যখন নিদারুণ মর্মান্বিত, ব্যথিত তখন আল্লাহ তাকে মি'রাজের সম্মান দান করেন। মি'রাজ এর অর্থ সিঁড়ি, সোপান, উর্ধ্বগমন। নবুওয়্যাতের একাদশ সনে রজব মাসের ২৭ তারিখে আল্লাহ তাআলা মহানবী (স) কে স্বশরীরে অতি অল্প সময়ে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে উর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ করিয়ে আনেন। রাসূলুল্লাহ (স) এর এই ভ্রমণকে মি'রাজ বলে। এ ভ্রমণে মহানবী (স) কে ‘বুরাক’ ও রফরফ’ নামক দুইটি দ্রুতগামী বাহন বহন করে। বায়তুল মুকাদ্দাসে তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁদের ইমাম হয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। সেখান থেকে সাত আসমান অতিক্রম করে তিনি আল্লাহর দীদার বা সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ প্রাপ্ত হন। মি'রাজ মহানবী (স) এর জীবনের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ ঘটনায় তিনি নতুন কর্মপ্রেরণায় উজ্জীবিত হন। তাই মহানবী (স) এর জীবনে মি'রাজের গুরুত্ব অত্যধিক।

মদীনায় হিজরত

৬২১ খ্রিস্টাব্দে হাজ্জের মৌসুমে মদীনা থেকে ১২ জন লোকের একটি দল মক্কা গমন করেন। গোপনে তারা আকাবা উপত্যকায় মহানবী (স) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পরের বছর হাজ্জের সময় মদীনা থেকে ২ জন মহিলাসহ ৭৫ জন সদস্যের অপর একটি দল মহানবী (স) এর সাথে আকাবায় মিলিত হন এবং তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করেন। তাঁরা মহানবী (স) কে মদীনা গমনের দাওয়াত দেন এবং তাঁদের সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়ে মহানবী (স) কে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেন। মহানবী (স) তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করেন। মক্কা যখন কুরাইশদের চরম বিরোধিতার কারণে ইসলামের প্রচার প্রসার চূড়ান্তভাবে বাধাগ্রস্ত হতে লাগল তখন তিনি মদীনায় হিজরত করার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকেন।

মক্কার কাফিররা যখন দেখল যে, আস্তে আস্তে মুসলমানগণ মক্কা ছেড়ে হিজরত করে চলে যাচ্ছে। মক্কা প্রায় মুসলিম

শূন্য হয়ে পড়েছে তখন তারা মনে করল, মহানবী (স) ও হয়ত দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। হয়রত মুহাম্মাদ (স) মক্কা ছেড়ে চলে যাবেন এই ভয়ে তারা সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মহানবী (স) কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। সে অনুসারে তারা রাতের বেলা মহানবী (স) এর ঘর অবরোধ করল। প্রত্যুষে নবীকে হত্যা করার অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে মহানবী (স) তাদের চোখ এড়িয়ে ঘর থেকে বের হলেন। হয়রত আবু বকর (রা) কে সঙ্গে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। গচ্ছিত সম্পদ প্রাপকদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মহানবী (স) হয়রত আলী (রা) কে তাঁর ঘরে রেখে যান। কাফিররা ঘরে ঢুকে মহানবী (স) এর বিছানায় হয়রত আলী (রা) কে দেখতে পেয়ে ক্রোধে অধীর হল, কিন্তু তখন আর কিছুই করার ছিল না।

মহানবী (স) ও আবু বকর সিদ্দীক (রা) কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মক্কার সাওর পর্বত গুহায় আশ্রয় নিলেন। এদিকে কাফিররা তাঁদের খুঁজতে খুঁজতে একেবারে গুহার মুখে এসে পড়ল। আবু বকর (রা) গুহার মুখে কাফিরদের গতিবিধি লক্ষ্য করে একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। মহানবী (স) বললেন, “আবু বকর চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।” তিন দিন সাওর পর্বতে অবস্থানের পর মহানবী (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর মদীনায় পৌঁছেন। মদীনার আবালবৃন্দবনিতা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন।

এ পাঠ থেকে আমরা জানলাম

১. মহানবী (স) এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তি ও ইসলাম প্রচার।

২. মিরাজের পরিচয় ও গুরুত্ব।

৩. মহানবী (স) এর মদীনায় হিজরত।

আমরা মহানবী (স) এর সর্বোত্তম চরিত্রের কথা জানব ও তার গুরুত্ব বুঝব এবং বলতে পারব। আমরা জানব তাঁর আদর্শ অনুসরণের মধ্যে আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সঠিক কল্যাণ নিহিত। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণে ব্রতী হব।

হয়রত হাম্মা (রা)

পরিচয়

বিখ্যাত সাহাবী বীরযোদ্ধা হয়রত হাম্মা (রা) ছিলেন মহানবী (স) এর চাচা। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা।

নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হয়ে মহানবী (স) প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন। আর এ কারণে কাফিররা শুরু করল বিরোধিতা—নির্যাতন। এরই মধ্যে একদিন মহানবী (স) সাফা পর্বতের পাদদেশে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন। পাপিষ্ঠ আবু জাহ্ল অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় তাঁকে তিরস্কার ও আঘাত করল। মহানবী (স) আবু জাহ্লকে কিছু না বলে চুপচাপ ঘরে ফিরে এলেন। হাম্মা (রা) কেবল শিকার থেকে ফিরেছেন। এ ঘটনা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে সে অবস্থায়ই তিনি কা'বা ঘরের চত্বরে হাজির হন। সেখানে তিনি অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের সাথে আবু জাহ্লকে দেখতে পেয়ে বাঘের ন্যায় গর্জন করে উঠলেন। ধনুক দ্বারা আবু জাহ্লের মাথায় আঘাত করতে করতে বললেন, “এত বড় সাহস যে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গালি-গালাজ ও তিরস্কার করতে পার।” আবু জাহ্ল বলল, “আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে বলেইতো আমি এ কাজ করেছি।” হাম্মা বললেন, “তবে শোন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) পড়ে আমিও মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করলাম।” হাম্মা (রা) মহানবী (স) এর নিকট তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে সব খুলে বললেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের কথাও জানালেন। হাম্মা (রা) এর ন্যায় বীরযোদ্ধার ইসলাম গ্রহণে মহানবী (স) অত্যন্ত খুশি হলেন।

বীরত্ব

হযরত হাম্‌যা (রা) ছিলেন পরাক্রমশালী সাহসী যোদ্ধা। তাঁর অতুলনীয় বীরত্বের জন্য তাঁকে “আল্লাহ ও রাসূলের সিংহ” আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণ করে হাম্‌যা (রা) মহানবী (স) ও ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি বিভিন্ন সংকট কালে মহানবী (স) এর সঙ্গে ছায়ার মত ছিলেন। মহানবী (স) যখন হযরত আর্কাম (রা) এর গৃহে গোপনে ইসলাম প্রচার কার্যে রত ছিলেন, তখন মহানবী (স) ও মুসলমানদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল হাম্‌যা (রা) এর ওপর। হযরত হাম্‌যা (রা) বদরের যুদ্ধের সময় মহাবীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সে যুদ্ধে আবু জাহ্লসহ অনেক কুরাইশ নেতা মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল।

উহুদ যুদ্ধের সময় কাফিরদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল হাম্‌যা (রা) কে হত্যা করা। কারণ বদর যুদ্ধে হাম্‌যার তরবারির আঘাতে অনেক কুরাইশ বীর নিহত হয়েছিল। তাই যুদ্ধের এক পর্যায়ে হাবশী ক্রীতদাস ওয়াহশী ইবন হার্ব এর বর্শার আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ও শাহাদাতবরণ করেন।

আমরা হাম্‌যা (রা) এর অমিত তেজবিক্রমের কথা জানব ও বলতে পারব। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করব।

হযরত ফাতিমা (রা)

পরিচয়

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদীজা (রা) এর কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন হযরত ফাতিমা (রা)। তাঁর জন্ম ৬০৫ খ্রীস্টাব্দে মক্কা নগরীতে। শৈশব হতেই তিনি যেমন ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারিণী, তেমনি ছিলেন সর্বপ্রকার সৎ চরিত্রের অধিকারিণী। তাঁর উপাধি ছিল ‘যাহুরা’ (অনিন্দ্য সুন্দরী, পরমা লাভণ্যময়ী) ও বাতুল (পবিত্র, সংসারে অনাসক্ত)। মহানবী (স) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হিজ্রি দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা) এর সাথে তাঁর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

হযরত ফাতিমা (রা) এর স্বামী হযরত আলী (রা) ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি আহাৰ্য জোটাতে। অভাবের তাড়নায় কখনও একবেলা খেয়ে, কখনও না খেয়ে তাঁদের দিন কাটত। কখনওবা দুই তিন দিন অনাহারে কাটাতেন। তবুও ধৈর্যহারা হতেন না। আত্মতৃপ্তিতে সর্বদা সমুজ্জ্বল থাকতেন। ফাতিমা (রা) সংসারের সকল কাজ নিজ হাতেই করতেন। সম্ভান পালন, স্বামীর সেবাসহ যাবতীয় কাজ তিনিই করতেন। যাঁতা পিষতে পিষতে তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে যেত। তাঁর কোন দাস-দাসী ছিল না। কোন সাজগোজ, জাঁকজমক তিনি পছন্দ করতেন না। একেবারে সাদাসিধে চলতেন তিনি।

দানশীলতা

এত অভাবের মধ্যেও ফাতিমা (রা) ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। কখনও ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। দুই তিন দিন অনাহারের পরে সামান্য আহাৰ্যের ব্যবস্থা হলেও যদি ভিক্ষুক দরজায় উপস্থিত হত তৎক্ষণাৎ তা ভিক্ষুককে দিয়ে দিতেন। নিজে শুধু পানি পান করে দিন কাটিয়ে দিতেন।

পিতার প্রতি অনুরাগ

মহানবী (স) এর ইনতিকালের সময় ফাতিমা (রা) কে ডেকে যখন তিনি বললেন, “মা আমার আর সময় নেই, আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব।” ফাতিমা (রা) পাগলপ্রায় হয়ে কান্না শুরু করেন। নবী (স) ফাতিমার এ অবস্থা দেখে আবার তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, “মা পরিবারের সকলের মধ্যে তুমিই আমার সাথে আগে মিলিত হবে।” ফাতিমা (রা) একথা শুনে খুশিতে হেসে ওঠলেন। হযরত ফাতিমা (রা) আদর্শ পিতামাতার সমস্ত গুণই অর্জন

করেছিলেন। সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য, দানশীলতা, লজ্জাশীলতা, পতিভক্তি, আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলির তিনি অধিকারিণী ছিলেন। তিনি বেহেশতের নারীকুলের সর্দার বা নেত্রী। ফাতিমা (রা) ছিলেন নবীজীর কলিজার টুকরো। তিনি বলেছেন, “যে ফাতিমাকে কষ্ট দেয় সে আমাকেই কষ্ট দেয়।” (বুখারী)। হযরত ফাতিমা (রা) ছিলেন ইমাম হাসান (রা) ও ইমাম হুসাইন (রা) এর আত্মা।

বিশ্বনারী জাতির আদর্শ হযরত ফাতিমা (রা) মহানবী (স) এর ইনতিকালের ছয় মাস পর ১১ হিজরি মোতাবেক ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আমরা ফাতিমা (রা) এর জীবন কাহিনী জানব ও বলতে পারব। তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করব।

হযরত বিলাল (রা)

পরিচয়

হযরত বিলাল (রা) ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী একজন ক্রীতদাস। তাঁর পিতার নাম রিবাহ্ এবং মাতার নাম ছিল হামামা। আবু আব্দুল্লাহ ছিল তাঁর ডাকনাম। উমাইয়া ইব্ন খালফ নামক এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন বিলাল। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই মুসলমান হয়েছিলেন।

নির্যাতন ভোগ

ইসলাম গ্রহণের কারণে বিলালের মনিব তাঁর ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায় এবং ইসলাম ত্যাগের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। বিলাল দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, “নির্যাতন যত কঠোরই হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ ঈমান ত্যাগ করব না।” বিলালের দৃঢ়তা দেখে মনিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং অমানবিক নির্যাতনে তাঁকে জর্জরিত করে। অত্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিলালকে নির্মমভাবে মারধোর করা হত। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থান ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হত। এ অবস্থায় যখন সন্ধ্যা নেমে আসত তখন পশুর মত গলায় রশি বেঁধে দুর্গন্ধময় কক্ষে রেখে দেওয়া হত। কখনওবা মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে বিলালকে চিৎ করে সূর্যের দিকে মুখ করে শুইয়ে রাখা হত। তার বুকের ওপর বড় বড় পাথরখণ্ড রেখে দেওয়া হত। বিলাল তখন যন্ত্রণায় ছটফট করতেন তবুও মনিবের সামান্য দয়া হত না। এ অবস্থায়ও বিলাল (রা) সর্বদা ‘আহাদ’ ‘আহাদ’ (“আল্লাহ এক”, “আল্লাহ এক”) বলতে থাকতেন। একথা শুনে মনিবের রাগ বেড়ে যেত, নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিত। কখনও কখনও বিলালের মনিব পাড়ার দুই ছেলেদের ডেকে এনে বিলালের গলায় রশি বেঁধে তাদের হাতে দিয়ে দিত।

মহানবী (স) বিলালের ওপর নির্যাতনের সংবাদ শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। একদিন হযরত আবু বকর (রা) সেপথ দিয়ে যাওয়ার সময় বিলাল (রা) এর ওপর নির্যাতনের বীভৎস অবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি বিপুল অর্থের বিনিময়ে বিলাল (রা) কে তাঁর অত্যাচারী মনিবের নিকট থেকে ক্রয় করে আশ্রয় করে দেন। এতে বিলালের চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। সকল বেদনা তিনি ভুলে যান।

বিলাল মহানবী (স) এর নির্দেশে মদীনায হিজরত করেছিলেন। তিনি মহানবী (স) এর সঙ্গী হতেন। ঈদ বা কোন অনুষ্ঠানে গমনকালে মহানবী (স) এর সামনে সামনে তার লাঠি নিয়ে চলতেন বিলাল (রা)। তিনি যুদ্ধের সময় রসদখানার দায়িত্বে থাকতেন। বিলালকে তাই মহানবী (স) এর খাযিন বা কোষাগার রক্ষক বলে আখ্যায়িত করা হয়। মদীনায হিজরতের পর আযানের প্রথা চালু হলে মহানবী (স) তাঁকে সর্বপ্রথম মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন। মক্কা বিজয়কালে নবীজীর নির্দেশে কা’বা শরীফের ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন বিলাল (রা)।

মহানবী (স) বিলালকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ২০ হিজরি মোতাবেক ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে তিনি দামিশ্কে ইনতিকাল করেন।

আমরা হযরত বিলাল (রা) এর আদর্শ অনুসরণ করব। শত বাধাবিপত্তি এলেও আমরা ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। অসত্য ও অন্যায়কে মেনে নেব না।

হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)

সংক্ষিপ্ত জীবন

বিখ্যাত সাহাবী মহাবীর হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ কুরাইশ বংশের মাখযুম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা লুবাবা বিন্তু হারিস ছিলেন নবী কারীম (স) এর সহধর্মিণী হযরত মাইমূনা (রা) এর বোন। এ দিক দিয়ে নবী কারীম (স) ছিলেন তাঁর খালুজান। কিশোর বয়সেই তিনি অশ্ব-চালনা, তীরন্দাযী, তলোয়ার চালনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ৮ম হিজরি সনে তিনি ইসলাম কবুল করেন। তিনি যেমন ছিলেন বীর সেনানী, তেমনি ছিলেন রণকৌশলী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। উহূদ যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন কাফিরদের দলে। তাঁর সুনিপুণ যুদ্ধ পরিচালনায় মুসলমানগণ এক পর্যায়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গানে বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন।

বীরত্ব ও রণকৌশল

মুতার যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব ও অপূর্ব রণকৌশল প্রদর্শন করেন। ৮ম হিজরি সনে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রথম পর্যায়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। একে একে তিনজন মুসলিম সেনাপতি শহীদ হন। এতে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। এ সংকটময় মুহূর্তে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বিস্ময়কর উদ্দীপনা ও শৌর্য বীর্য প্রদর্শন করতে থাকেন। এতে মুসলিম বাহিনীর উৎসাহ বহুগুণে বেড়ে যায়। তারা নতুন উদ্যমে যুদ্ধ করতে থাকে। এছাড়া তিনি মুসলিম বাহিনীকে সম্পূর্ণ নতুন করে সাজান। সম্মুখ ভাগের সৈন্যদলকে পেছনের সারিতে এবং পেছনের সারির সৈন্যদলকে অগ্রভাগে, ডানদিকের সৈন্যদলকে বামপাশে এবং বামপাশের সৈন্যদলকে ডানপাশে স্থাপন করেন। এ দৃশ্য দেখে কাফির সৈন্যদল বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা ভাবল, মুসলমানগণ মদীনা থেকে নতুন সৈন্য আমদানী করেছে।

তাই তারা সহসা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করল। মুসলমানগণ বিজয়ী হলেন। মুতার যুদ্ধে হযরত খালিদ (রা) এর বীরত্ব ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে মহানবী (স) তাঁকে উপাধি দেন ‘সাইফুল্লাহ’ বা আল্লাহর তরবারি। তিনি মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। নবম হিজরিতে দুমাতুল জানদালের খৃষ্টান রাজার বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। দশম হিজরিতে নাজরানে অভিযান পরিচালনা করেন।

মহানবী (স) এর ইনতিকালের পর হযরত আবু বকর (রা) খলীফা হয়ে তিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান করেন। একাদশ হিজরিতে ভডনবী তুলাইহাকে দমনের জন্য খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে হযরত আবু বকর (রা) প্রেরণ করেন। এছাড়াও তিনি মুসাইলিমা কায্যাব, সাজাহুসহ অন্যান্য ভডনবীদের দমন করে ইসলামী রাষ্ট্রে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তিনি পারস্য, সিরিয়া ও দামিшке সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ

৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে দামিшке জয়ের প্রাক্কালে হযরত উমার (রা) তাঁকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করেন। ময়দানে যুদ্ধ পরিচালনারত অবস্থায় তিনি তাঁর পদচ্যুতি এবং তাঁর পদে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা) এর নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হন। সাথে সাথে তিনি বাহিনী প্রধানের প্রতীক চিহ্ন খুলে আবু উবাইদাকে দিয়ে দেন এবং নিজে সাধারণ সৈনিকের ন্যায় সজুটচিহ্নে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সত্যিকার মুসলমান ব্যক্তি পদের জন্য নয় বরং ইসলামের জন্য যুদ্ধ করতে পারাকেই গৌরবের বিষয় মনে করে থাকেন। তাইতো ইসলামের খিদমতের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) সেনাপ্রধানের পদ থেকে অপসারিত হয়েও সজুটচিহ্নে একজন সাধারণ সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধ করেন।

খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) ইসলামের খিদমতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তার অবদান অপরিসীম।

২১ হিজরি মোতাবেক ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ মহাবীর হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) মদীনায় ইনতিকাল করেন।

আমরা হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) এর শৌর্য-বীর্য ও যুদ্ধের ময়দানে তাঁর কৃতিত্বের কথা জানব ও বলতে পারব। আমরা তার আদর্শ অনুসরণ করব।

হযরত ইমাম শাফিঈ (র)

বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞান তপস ইমাম শাফিঈ (র) এর পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ শাফিঈ। তাঁর নাম অনুসারেই তার প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের নামকরণ করা হয়েছে শাফেঈ মাযহাব। তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশ বংশের হাশিমী গোত্রভুক্ত এবং নবী কারীম (স) এর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ১৫০ হিজরি মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফিলিস্তিনের গাযা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। এরপর তাঁর মাতা তাঁকে মক্কায়ে নিয়ে আসেন। এখানে অত্যন্ত অস্বচ্ছলতার মধ্যে তাঁদের জীবন কাটে। প্রথর স্মৃতিশক্তির অধিকারী শাফিঈ এর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় মক্কা শহরেই। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন। তারপর আরবি ভাষা ও প্রাচীন আরবি কবিতা শিক্ষা করেন। এরপর মক্কায়ে প্রখ্যাত আলেমগণের নিকট হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এ সময় তিনি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ ‘মুয়াত্তা সম্পূর্ণ মুখস্থ করে ফেলেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি মদীনায়ে গমন করেন এবং সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করে ইমাম মালিক ইবন আনাস (র) এর নিকট থেকে হাদীসসহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি ইয়ামনে গমন করে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুকাল চাকুরী করার পর পুনরায় জ্ঞান অর্জনের জন্য বিখ্যাত আলিম মুহাম্মাদ ইবন হাসান আশ-শাইবানী (র) এর নিকট হাজির হন। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে তিনি বাগদাদ গমন করেন এবং শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। এরপর মিসর গমন করেন। এখানে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় তিনি মক্কা শরীফ চলে যান। ২০০ হিজরিতে পুনরায় মিসর গমন করেন। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। বহু সংখ্যক জ্ঞানী-গুণী তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। ইমাম শাফিঈ একই সাথে বিখ্যাত হাদীস বিশারদ এবং ইসলামী আইনবিদ ছিলেন। উসূলে ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের মূলনীতি নামক শাস্ত্রের তিনি ছিলেন প্রবর্তক। তিনি হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানের ওপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুবহূ গ্রন্থ “কিতাবুল উম্মত” জগৎখ্যাত।

২০৪ হিজরি মোতাবেক ৮২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিসরের ফুসতাত নগরে ইনতিকাল করেন।

আমরা ইমাম শাফিঈ (র) এর জীবন ইতিহাস জানব ও বলতে পারব। আমরা তাঁর জ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হব।

হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী (র)

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইরানের সীস্তান অঞ্চলের “সানজার” গ্রামে বিশ্ববিখ্যাত কামিল ওলি হযরত মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতী (র) ৫৩৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাজা গিয়াসুদ্দীন (র)। তাঁকে আফতাবে হিন্দ (ভারত সূর্য), সুলতানুল হিন্দ (ভারতের আধ্যাত্মিক সম্রাট), গরীব নওয়ায (গরীব দরদী) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শিশু বয়সেই তার মধ্যে একজন অতি উন্নত চরিত্রের গুণাবলি ফুটে উঠেছিল।

শিক্ষা

তিনি নয় বছর বয়সেই পবিত্র কুরআনের হাফিয হন। এরপর তাফসীর, হাদীস, ফিকহসহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিখ্যাত ওলি হযরত উসমান হারুনী (র) এর সান্নিধ্যে হাজির হয়ে এখানে তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। ওখান থেকে তিনি মা’রিফাতের সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করেন। এরপর পীরের নির্দেশে হিদায়াতের কাজে দেশ-বিদেশে সফরে বের হন। তিনি পীরের দরবার হতে বিদায় নিয়ে মক্কা শরীফ হয়ে মদীনায়ে হাজির হন। তারপর তিনি ভারতবর্ষের দিকে রওনা হন। তখন ভারতবর্ষে চলছিল

অত্যাচারী হিন্দু শাসকদের কুশাসন। তিনি তাই প্রথমেই দিল্লী হাজির হন। সেখান থেকে আজমীর শরীফ এসে অবস্থান করেন। তার হিদায়াতে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে সেখানকার হিন্দুরাজা স্বীয় রাজ্য হারানোর ভয়ে মুঈনুদ্দীন চিশ্তী ও তার অনুসারীদের ওপর নানা রকম অত্যাচার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু মুঈনুদ্দীন চিশ্তীর কারামতের কাছে তার কোন কৌশলই ফলপ্রসূ হয়নি। বরং মুঈনুদ্দীন চিশ্তী (র) এর অনুসারীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অতঃপর মুঈনুদ্দীন চিশ্তী (র) স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর প্রচারের ফলে লাখ লাখ অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমানগণ শিরক বিদআতসহ সর্বপ্রকার কুসংস্কার ত্যাগ করে পুতঃপবিত্র ও সাচ্চা মুসলিমে পরিণত হন। ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

চারিত্রিক মাধুর্য

হযরত মুঈনুদ্দীন চিশ্তী (র) ছিলেন সর্বপ্রকার উত্তম চরিত্রগুণে গুণাবিত। গরীব-দুঃখীদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। অসংখ্য অসহায়, আশ্রয়হীন দরিদ্র মানুষ তাঁর দরবারে অবস্থান করত। লক্ষ লক্ষ অমুসলিম যে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তা কোন যুগের ফলে নয় বরং তাঁর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েই। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে ‘আনীসুল আরওয়াহ’। মহান ওলি হযরত মুঈনুদ্দীন চিশ্তী (র) ৬৩৩ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন। আজমী তাঁর খানকার পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় মুঈনুদ্দীন চিশ্তী (র) রেখে গেছেন এক অনুকরণীয় আদর্শ। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করব।

শাইখ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র)

পরিচয়

প্রাচীন পূর্ব বাংলায় কুরআন-হাদীসের শিক্ষা বিস্তারে যাঁর অবদান ছিল অপরিসীম, তিনি হলেন শাইখ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র)। তিনি বর্তমান উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের বুখারা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত আলিম।

শিক্ষা

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী আবু তাওয়ামা (র) কুরআন, হাদীস, ফিক্হ শাস্ত্রসহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি বিশেষভাবে হাদীস গ্রন্থ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। স্বদেশে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করেও আবু তাওয়ামা (র) এর জ্ঞান পিপাসা মিটল না, তাই তিনি ইরানের খুরাসান গমন করেন। সেখানে তিনি ইসলামী জ্ঞানের সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়েও উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শিক্ষা প্রচার

শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করে আবু তাওয়ামা (র) ইসলামী শিক্ষা দান ও প্রচারে ব্রতী হন। খুরাসান থেকে তিনি এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে দিল্লীতে এসে পৌঁছেন। সেখানে তিনি একটি মসজিদের সাথে মাদরাসা স্থাপন করে কুরআন-হাদীসসহ ইসলামী শিক্ষা প্রচার করতে শুরু করেন। কিছু দিনের মধ্যে দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভের জন্য সেখানে হাজির হতে থাকে। তখনকার দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি আবু তাওয়ামা (র) এর সুখ্যাতির কথা শ্রবণ করে মুগ্ধ হন। শিক্ষা লাভের জন্য তিনিও মাঝে মাঝে তাঁর শিক্ষায়তনে উপস্থিত হতেন।

ষড়যন্ত্র

আবু তাওয়ামা (র) এর সম্মান ও সুখ্যাতি কতিপয় দুষ্ক লোকের ঈর্ষার কারণ হয়। তারা বাদশাহকে নানারূপ কুপরামর্শ দিতে থাকে। তারা তাঁকে বাদশাহের সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে সাব্যস্ত করে। অবশেষে সুলতান তাকে দিল্লী ত্যাগ করতে বলেন। তিনি দিল্লী থেকে পূর্ব বাংলার তৎকালীন রাজধানী সোনারগাঁয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ৬৬৮ হিজরি সনে তিনি সোনারগাঁও উপস্থিত হন এবং একটি বৃহৎ মাদরাসা স্থাপন করে শিক্ষাদান শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই চারদিকে মাদরাসার সুনাম ছড়িয়ে পড়লে দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্র সেখানে হাজির হতে থাকে। সোনারগাঁয়ের তৎকালীন শাসক গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ আবু তাওয়ামা (র) এর সুখ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ছিল একটি আধুনিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ। শাইখ আবু তাওয়ামা (র) কুরআন হাদীসে অশেষ জ্ঞান রাখতেন। এছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি সোনারগাঁওয়ে গবেষণাগার, খানকা, লজ্জারখানা, মসজিদ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে লোকদের স্বনির্ভর করে তোলার ব্যবস্থা ছিল। তাঁর শিক্ষায়তনেরই ছাত্র শারফুদ্দীন ইয়াহুইয়া মানেরী তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাপস হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। আবু তাওয়ামা (র) বিভিন্ন শাস্ত্র বিশারদ, প্রজ্ঞাশীল মনীষী ছাড়াও উচ্চস্তরের একজন ওলী ও সাধক ছিলেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এদেশে ইসলামী শিক্ষা ও তাহযীব-তামাদ্দুনের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হয়। তিনি ৭০০ হিজরি সনে সোনারগাঁওয়ে ইনতিকাল করেন।

আমরা হযরত আবু তাওয়ামার জীবন ইতিহাস জানব এবং তাঁর জ্ঞান-সাধনা ও ইসলাম প্রচার থেকে প্রেরণা লাভ করব। জ্ঞান বিতরণ ও ইসলাম প্রচারে নিজেদের নিয়োজিত করব।

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র)

পরিচয়

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলাম প্রচারকগণের অন্যতম। তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর বংশধর। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের জৌনপুর শহরে ১২১৫ হিজরি সনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবু ইবরাহীম শাইখ মুহাম্মাদ ইমাম বখশ (র) ছিলেন সে সময়ে ঐ অঞ্চলের ধর্মীয় নেতা।

শিক্ষা

আরবি, উর্দু, ফার্সি প্রভৃতি ভাষায় তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। অল্প বয়সেই তার চরিত্র মাধুর্য, বাগ্মিতা ও জ্ঞান সাধনার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলমানদের নানারূপ কুসংস্কার ও বিজাতীয় আচার-আচরণে লিপ্ত দেখে তিনি কষ্ট অনুভব করতেন এবং এ অভিপাতি থেকে তাদের মুক্ত করার চিন্তা করতেন। তাই ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ইল্ম শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে মুসলমানদের ঘরে ঘরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাদের রোযা, নামায ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। অমুসলিমদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বর্জনের আহ্বান জানাতেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করে মাওলানা জৌনপুরী স্বীয় পীর শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) এর নির্দেশে হিদায়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রথমে জৌনপুর, গাজীপুর, আযমগড়, ফয়যাবাদ এলাকায় দ্বীনের প্রচার

কাজ চালান। এসকল স্থানে অসংখ্য মাদ্রাসা, মসজিদ, মক্তব প্রতিষ্ঠা করে খাঁটি মুসলমান তৈরির ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি আসাম, পূর্ব বাংলা, কলিকাতা, পশ্চিম বাংলাসহ বিস্তৃত অঞ্চলে সুদীর্ঘ ৫১ বছর পর্যন্ত সফর করেন। এ সময় তিনি এসকল জনপদের প্রতিটি অঞ্চলে মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে দীনের প্রচার কার্য পরিচালনা করেন। তাঁর এ দীর্ঘকালব্যাপী সর্বাত্মক প্রচারের ফলে সর্বত্র ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি হয়। মুসলমানগণ শিরক, বিদআত ও নানাবিধ কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেতে থাকে। আসাম ও বাংলার অনেক অঞ্চলে তখন মুসলমানগণ বিজাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পোশাক পরিচ্ছদে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুসলমানদের সকল অপসংস্কৃতি ত্যাগ করে ইসলামী আমল আখলাক গ্রহণ করতে সর্বাত্মক আহ্বান জানান। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুর, বরিশালসহ বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে ইসলামের দাওয়াত দেন। এসব অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত “মিফতাহুল জান্নাত” গ্রন্থখানি সর্বজন সমাদৃত।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফরের এক পর্যায়ে তিনি রংপুর শহরে পৌছেন। এখানে তিনি ১২৯০ হিজরি সনের ৩রা রবিউস সানি শুব্বার ইনতিকাল করেন।

আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করব। ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন মেনে চলব। অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার থেকে দূরে থাকব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। কার পায়ের কাছ থেকে জমজম কূপের সৃষ্টি হয় ?

ক. হযরত ইসমাইল (আ)	খ. হযরত ইবরাহীম (আ)
গ. হযরত নূহ (আ)	ঘ. হযরত শীষ (আ)
- ২। হযরত ইবরাহীম (আ) এর শিশুপুত্র ইসমাইলের কুরবানী মানব চরিত্রের কোন দিক ফুটে উঠেছে?

ক. ত্যাগ	খ. ধৈর্য
গ. সততা	ঘ. সহমর্মিতা
- ৩। হযরত ইউসুফ (আ) ছিলেন—

ক. বাণিজ্য মন্ত্রী	খ. খাদ্য মন্ত্রী
গ. অর্থ মন্ত্রী	ঘ. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী
- ৪। ইসলাম প্রচারকালে রাসূল (স) কে গালি দিত ও পাগল, যাদুকর ইত্যাদি আখ্যা দিত—

ক. মক্কার কুরাইশরা	খ. মক্কার কাফিররা
গ. ইসলাম বিরোধীরা	ঘ. ইয়াহুদীরা

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিফাত শারীরিক অসুস্থতায় অধৈর্য হয়ে পড়ল। তার বন্ধু ওলী তাকে সাহায্য দিয়ে বলল—হযরত আয্যুব (আ) এর শরীরে ক্ষতরোগের কারণে মাংস পচে পোকা ধরেছিল। অথচ তিনি আল্লাহর যিক্র থেকে বিরত থাকেননি।

৫। অসুস্থাবস্থায় রিফাতের কি করা উচিত—

- i. ধৈর্য ধারণ করা
- ii. ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া
- iii. নিজের বুদ্ধিমত ঔষধ সেবন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|-----------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |

৬। হযরত আয্যুব (আ) অসুস্থ অবস্থায়ও আল্লাহর যিক্রের মশগুল ছিলেন—

- i. আল্লাহর নবী ছিলেন বলে
- ii. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য
- iii. এলাকার লোকদের ভয়ে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জিলহাজ্জ মাসের চাঁদ উঠেছে। তাহমিনা বলল, আবু-কুরবানীর ঈদ কখন হবে ? বাবা বললেন—আর দশ দিন পর, জিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ। তাহমিনা বলল—কোন সময় থেকে পশু কুরবানী করা শুরু হয়েছে ? বাবা বললেন—হযরত ইবরাহীম (আ) শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ) কে কুরবানী দিতে গিয়ে আল্লাহর মহিমায় অলৌকিকভাবে একটি দুশ্কা কুরবানী হয়ে যায়। তখন থেকে পশু কুরবানী শুরু।

- ক. হযরত ইসমাঈল (আ) কে ছিলেন ?
- খ. হযরত ইবরাহীম (আ) কেন পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী দেন।
- গ. হযরত ইসমাঈল (আ) এর কুরবানী সম্পর্কিত ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষা নিতে পারি—ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পিতার প্রস্তাবে ইসমাঈল (আ) এর ধৈর্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বুঝিয়ে লিখ।

২। মুনতাসির শুনছে দেশে দেশে মুসলিমরা ইসলামবিরোধী শক্তির হাতে মার খাচ্ছে। ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানরাও ইসলাম গ্রহণের কারণে প্রচণ্ড বিরোধিতা ও নির্যাতনের শিকার হন। হযরত বিলাল (রা) কে মক্কার কুরাইশরা প্রচণ্ড নির্যাতন করেছিল। শত নির্যাতনের মুখেও তিনি ইসলাম ত্যাগ করেননি বরং বলেছিলেন ‘আহাদ’, ‘আহাদ’।

- ক. আহাদ শব্দের অর্থ কী ?
- খ. হযরত বিলাল (রা) এর উপর নির্যাতনের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. ইসলামের পথে মুনতাসির নির্যাতিত হলে তার কী করা উচিত হবে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ইসলাম কীরূপ ত্যাগ ও ধৈর্যের শিক্ষা দেয়—হযরত বিলাল (রা) এর ঘটনার আলোকে বর্ণনা কর।

৩। জনাব শাব্বির আহমেদ তার অসুস্থ বাবাকে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে এসে চিকিৎসা করাতে থাকেন। বহুমুত্র রোগ ধরা পড়ার পর তাঁর কিডনীতে সমস্যা দেখা দেয়। দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকার পরও কোন উন্নতি হয়নি। এক বছর পর চোখের সমস্যা দেখা দেয়। তিনি তার বাবাকে দুই বছর যাবৎ নিজের বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করাচ্ছেন। শাব্বির আহমেদ সাহেবের দুই ভাই হাসপাতালে থাকাকালীন অবস্থায় বাবাকে দেখতে আসত। এখন তারা আর কোন খোঁজ-খবর রাখে না। তিনি তার মেয়ে নুরজাহানের সাথে হযরত আয়্যুব (আ) এর অসুস্থতা এবং তাঁর স্ত্রীর সেবা নিয়ে আলোচনাকালে নুরজাহান বলল, বাবা আমরা সকলে হযরত আয়্যুব (আ) এর স্ত্রীর সেবা ও ধৈর্য থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

ক. হযরত আয়্যুব (আ) এর স্ত্রীর নাম কী ছিল ?

খ. হযরত আয়্যুব (আ) এর অসুস্থতার বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

গ. হযরত আয়্যুব (আ) এর স্ত্রীর সেবা থেকে নুরজাহান কী শিক্ষা নিতে পারে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “রোগীকে সেবা করা একটি মহৎ কাজ”- বুঝিয়ে লেখ।

পর্যবেক্ষণ ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করা।
২. ইসলামের বিষয়বস্তু অনুধাবনের পরিধি যাচাই করা।
৩. শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পঠিত বিষয়ের মৌলিক দিকগুলো আয়ত্তকরণ ও পর্যালোচনা করা।
৪. সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যবিষয়ের ওপর সম্ভব হলে সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যাচাই করা।
৫. ইবাদাত করার প্রবণতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে কি না তা যাচাই করা।
৬. নিজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলাম শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ও রেকর্ড মূল্যায়ন করা।
- ৭। মসজিদ, নামায ঘর, মক্তব, লাইব্রেরী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও দায়িত্ব পালনের রেকর্ড মূল্যায়ন করা।
৮. কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ ও ইসলামী সাহিত্য এবং পত্রপত্রিকা পাঠ সম্বন্ধে ধারণা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা।
৯. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ইসলামী বিধানের প্রয়োগ ও গুরুত্ব সম্পর্কে অর্জিত ধারণা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ছক

পোশাক-পরিচ্ছদ	আচার-আচরণ	শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি	ধর্মীয়/সামাজিক কর্মকাণ্ড	অভিভাবক/শিক্ষকের অভিমত	সামগ্রিক মূল্যায়ন

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. নৈতিক চরিত্র গঠনে কুরআনের শিক্ষা- ডঃ আহমেদ শামসুল ইসলাম
২. ইহুইয়াউ উলূম-আদ-দ্বীন- ইমাম গায্যালী (র)
৩. শরহে বিকায়া- মাওলানা নূরুদ্দীন আহমাদ কর্তৃক অনূদিত
৪. আল-কুরআনুল কারীম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
৫. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন- মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)
৬. হাদীস সংকলনের ইতিহাস- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম
৭. সাইয়েদুল মুরসালীন- আবদুল খালেক (ই. ফা)
৮. বিশ্বনবী- গোলাম মোস্তফা
৯. মানুষের নবী- মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী
১০. মরু ভাস্কর- কাজী নজরুল ইসলাম
১১. সাহাবা চরিত- আখতার ফারুক
১২. নবীগৃহ সংবাদ- মুহাম্মদ বরকত উল্লাহ
১৩. গুনিয়াতুত্ তালাবীন- বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র)
১৪. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
১৫. হযরত ফাতিমা (রা)- মনিরুদ্দীন ইউসুফ

সমাপ্ত